স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা।। ২১ মে - ২০১২।। ৭ জ্যৈষ্ঠ - ১৪১৯।। দাম : সাত টাকা

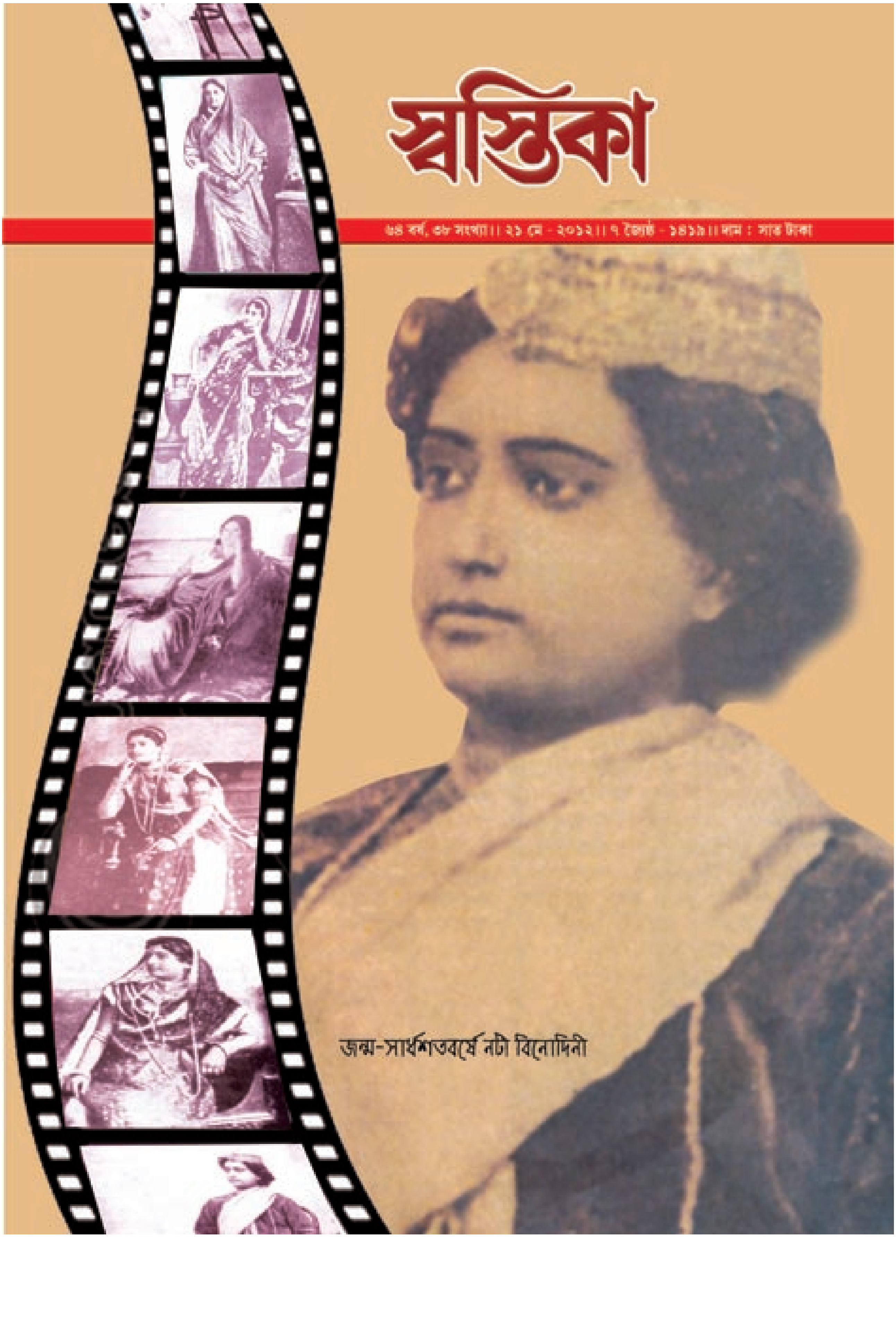

জন্ম-সার্ধশতবর্ষে নটী বিনোদিনী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ৬-৯

ঘরে বাইরে কোণঠাসা সি পি এম ১০

ইন্ডিয়া থেকে ভারত ডঃ স্বরূপ ঘোষ ১১

আমার অভিনেত্রী জীবন বিনোদিনী দাসী ১৪

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে নটী বিনোদিনী বিকাশ ভট্টাচার্য ১৫

নটী বিনোদিনী : সমকালীন সমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা অর্ণব নাগ ১৬

দেশের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করলো জাতীয় মহাফেজখানা ২১

পৌরাণিক নগর : মিথিলা গোপাল চক্রবর্তী ২২

লৌকিক দেবতা : গেঁড়ি বুড়ি নবকুমার ভট্টাচার্য ২৩

অনন্য প্রতিভার অধিকারিণী বিনোদিনী ইন্দিরা রায় ২৬

খোলা চিঠি : ম্যাডাম সোনিয়া গান্ধী আপন অর্থ বিলোচ্ছেন, হাত পাতুন সুন্দর মৌলিক ২৭

ভারত-বিরোধী শক্তি আবার সক্রিয় বাংলাদেশে রাজীব শর্মা ২৮

দক্ষিণ চীন সাগর দখল করতে চাইছে চীন ৩০

মালদার গাজোল থেকে হিলি সীমান্ত দিয়ে গোরু পাচার হচ্ছে ৩১

সোজা-সাপ্টা : ইমাম ভাতা ও হাসিম শেখ হাফিজ ইব্রাহিম ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ভাবনা-চিন্তা : ২০ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ অন্যরকম : ৩৫ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৮ রঙ্গম : ৩৯ শব্দরূপ : ৪০ চিত্রকথা : ৪১ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

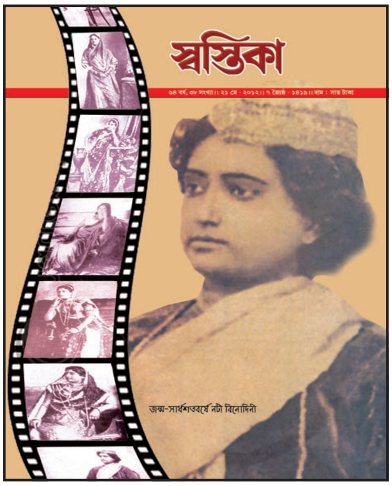

জন্ম সার্ধশতবর্ষে নটী বিনোদিনী
পৃ ঃ ১৪-১৮

প্রচ্ছদ পরিচিতি : প্রচ্ছদের মূল ছবিটি শরৎ-সরোজিনী নাটকে পুরুষবেশে নটী বিনোদিনীর। এছাড়াও (ওপর থেকে নীচে) বিবাহ বিভ্রাট প্রহসনে বিলাসিনী কারফর্মার ভূমিকায়, মোহিনী প্রতিমা গীতিনাট্যে, সাধারণ বেশে, আয়েষার ভূমিকায় ও সাধারণ সজ্জায় নটী বিনোদিনীর আলোকচিত্র। নীচের শেষ ছবিটি শরৎ-সরোজিনী নাটকের।

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ২১ মে - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬
হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিশেষ বিষয় : পাকিস্তানে হিন্দু নির্যাতন

পাকিস্তানে হিন্দু নির্যাতন কোনও নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু পুরনো ঘটনাই সাম্প্রতিককালে বারবার ঘটে যাওয়ায় নতুন করে ইন্ধন পাচ্ছে মুসলিম দুনিয়ার হিন্দু-বিরোধী ষড়যন্ত্র। এনিয়ে ভারত সরকার কিন্তু নির্বিকার। মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে সরকারের হিন্দু-বিরোধী মনোভাবে চরম সর্বনাশের মুখে পাকিস্তানের হিন্দুরা।

লিখেছেন : **বাসুদেব পাল, অবিনাশরাই খান্না** প্রমুখ।

এছাড়াও অন্যান্য বিষয় তো থাকছেই।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

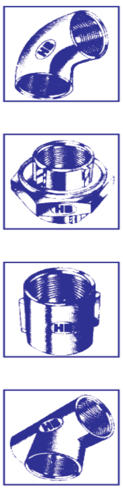

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সংখ্যালঘু ভর্তুকি

হজ যাত্রীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভর্তুকি দশ বৎসরের মধ্যে ধাপে ধাপে তুলিয়া দিবার নির্দেশ দিয়াছেন ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয়। এই নির্দেশের ফলে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে শোকের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। কারণ, সংখ্যালঘুদের এতদিন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও নানা ভর্তুকি দিয়াই তাহারা এই সম্প্রদায়ের ভোট কুড়াইতে সমর্থ হইয়াছেন। মুসলমান ভোটের লোভেই এদেশে চরম সন্ত্রাসবাদী জঙ্গীও 'মহাপুরুষে' পরিণত হইয়াছে। তাই হজ ভর্তুকিসহ মুসলমানদের জন্য অন্যান্য ভর্তুকি বন্ধ হইলে এই রাজনৈতিক দলগুলির চরম ক্ষতির সম্ভাবনা। উচ্চতম ন্যায়ালয় বলিয়াছেন— হজ ভর্তুকির অর্থ মুসলমানদের জন্য শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নে খরচ করিতে হইবে। সমস্যা হইতেছে মুসলমানরা শিক্ষিত হইলে ইমাম-মোল্লাদের প্রভাব কমিবে। ইমাম মোল্লাদের প্রভাব কমিলে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে ভোট বন্ধ হইবে। ইমাম মোল্লাদের নির্দেশ অমান্য করিয়া মুসলিম সম্প্রদায় বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী ভোট দিলে সেকুলার সাজিয়া থাকা রাজনৈতিক দলগুলির বিপদ বাড়িবে। তাই মুসলিম সম্প্রদায়কে অশিক্ষিত করিয়া রাখিবার এত প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নকামী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই একই পথের পথিক। সংখ্যালঘুদের শিক্ষিত করিবার জন্য তিনি যতই হা-হুতাশ করুন না কেন তিনিও চান না মুসলমানরা প্রগতিশীল শিক্ষিত হউক। সেজন্যই মুসলমানদের জন্য দশ হাজার বিদ্যালয় নয়, দশ হাজার মাদ্রাসা খুলিবার অনুমোদন দিয়াছেন। তিনিও চান মুসলমানরা মাদ্রাসার গণ্ডিতে কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকুন। মুসলমানদের সামাজিক উন্নয়নের বদলে ইমাম মোয়াজেমদের ভর্তুকি দিয়া তিনিও এই সম্প্রদায়ের বেড়াজালকে সুদৃঢ় করিতে চাহিয়াছেন। মুসলিম সম্প্রদায়কে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে চাহিলে তিনি মুসলমান যুবকদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেন।

হজযাত্রা হইতেছে ইসলাম ধর্মমতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলাম ধর্মের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানকে জীবনে একবার হজে যাইতে হইবে। তবে এই যাওয়া বাধ্যতামূলক নহে। কেবলমাত্র তিনিই হজে যাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি, যাহার আর্থিক সামর্থ্য রহিয়াছে এবং যিনি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ। প্রতি বৎসর দেশ হইতে ১ লক্ষের মতো ধর্মপ্রাণ মুসলমান হজযাত্রা করিয়া থাকেন। এই হজযাত্রা নির্দিষ্ট করিয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকার। গত বৎসরে হজযাত্রীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১৪ হাজার ২৩ জন। সরকার হজ কমিটির মাধ্যমে মুসলমানদের তথাকথিত নেতাদের অর্থাৎ ইমাম মোল্লাদের হাতে এই দায়িত্ব দেন। আর এই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া ইমাম মোল্লারা তাহাদের সমাজে নেতা হইয়া উঠেন। ভোটের সময় রাজনৈতিক নেতারা এই ইমাম মোল্লাদের তোয়াজ করিয়া ভোটের বাক্সে তাহার প্রতিফলন ঘটান। উচ্চতম ন্যায়ালয় ইমাম মোল্লা ও রাজনৈতিক দলের হজ লইয়া এই অশুভ আঁতাত ভাঙিবার প্রচেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মুসলিম তোষণ যেভাবে সমাজের সর্বস্তরে ডালপালা মেলিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ রদ হইবার সম্ভাবনা কম। সমাজের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের দয়ায় বাঁচিয়া থাকিবে কিনা তাহা তাহাদেরই সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে টোল-শিক্ষার অবলুপ্তি ঘটাইয়া দশ হাজার মাদ্রাসাকে অনুমোদন দিবার ভণ্ডামি বেশীদিন চলিতে পারে না।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

প্রকৃত 'আমিত্ব' সেই পূর্ণব্রহ্ম—মায়া দ্বারাই উহা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির আকার ধারণ করিয়াছে। আপাততঃ এইরূপ বোধ হইতেছে মাত্র, প্রকৃতপক্ষে উহা সর্বদাই সেই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে এক সত্তাই বিদ্যমান—মায়া দ্বারাই উহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। মায়াতেই এইরূপ ভেদবোধ হইয়াছে। কিন্তু এই মায়ার ভিতরেও সর্বদাই সেই একের দিকে ফিরিয়ে যাইবার চেষ্টা রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতির চারিত্রনীতির ভিতর ঐ চেষ্টাই অভিব্যক্ত হইয়াছে, কারণ ইহা জীবাত্মার প্রকৃতিগত প্রয়োজন। সে ঐরূপ চেষ্টায় ঐ একত্ব লাভ করিতেছে, আর একত্বলাভের এই চেষ্টাকেই আমরা চারিত্রনীতি-নামে অভিহিত করিয়া থাকি। অতএব আমাদের সর্বদা নীতিপরায়ণ হওয়া আবশ্যক।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

এন সি টি সি বিশ বাঁও জলে

জঙ্গি দমনে বিহারে কর্ণাটক পুলিশের হস্তক্ষেপে ক্ষোভ নীতিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিহারে নীতিশ কুমার সরকারের অজ্ঞাতে কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর শহর পুলিশের অপরাধ দমন বিভাগ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের পুলিশ অফিসাররা যৌথ অপারেশন চালায় বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলায়। দ্বারভাঙ্গার বরসমেলা গ্রাম থেকে ধরা পড়ে লস্কর-এ-তৈবা এবং ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের দুই কট্টর জঙ্গি। ফলে বেজায় চটেছেন নীতিশজী।

ধৃত জঙ্গিরা হলেন মহম্মদ খফিল আফতার ওরফে খফিল এবং সৈয়দ আবদুল রহমান ওরফে আবদুল রহমান। গত ৬ মে এদের পাকড়াও করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যাঙ্গালোরের পুলিশ কমিশনার জ্যোতিপ্রকাশ মিরজি। তিনি বলেছেন, ২০১০-এ ব্যাঙ্গালোরের চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শ্রী মিরজি জানিয়েছেন, খফিল কুখ্যাত ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন-এর উঁচুদরের নেতা ইয়াসিন ভাটকলের সহযোগী। আবদুল রহমান নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর এ তৈবা'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বলে পুলিশ-এর বক্তব্য।

জ্যোতিপ্রকাশ জানিয়েছেন, খফিলকে গ্রেপ্তারের পর রাঁচী আদালতে হাজির করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশী হেফাজতে নেওয়া হয়। এই নিয়ে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম বিস্ফোরণে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তারের সংখ্যাটা দাঁড়াল ৭। জ্যোতিপ্রকাশ মিরজির কথায় আব্দুল রহমান পাতি ক্রিমিন্যাল। সিমোগা জেলে থাকার সময় তার সঙ্গে পাক-নাগরিক ফাহাদের ঘনিষ্ঠতা হয়।

নীতিশ কুমার, ডানদিকে ব্যাঙ্গালোরের পুলিশ কমিশনার জ্যোতিপ্রকাশ মিরজি।

ফাহাদ লস্কর-এ-তৈবার অধীনস্থ জেহাদি সংগঠন 'আলবদর'-এর সদস্য। আব্দুল রহমানকে জেহাদ-এর প্রচারমূলক ভিডিয়ো ক্লিপিংস, বই-পত্র দিয়ে মগজ ধোলাই করে পাকিস্তানী লস্কর-এ-তৈবা নেতাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। পরে ফাহাদ ও তার এক সঙ্গী আফসরকে গুলবর্গা জেলে স্থানান্তর করা হয়। রহমান মাস চারেক আগে জামিনে ছাড়া পেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল। ওই সময়ে সে পাকিস্তানী লস্কর-এ-তৈবার নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখত। রহমানকে মুসলমান যুবকদের প্রশিক্ষণ এবং ব্যাঙ্গালোর-এর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য এবং বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের নেতাদের হত্যা করার জন্য পাকিস্তান থেকে প্রচুর টাকা পাঠানো হয়। এসব কথা জানিয়েছেন জ্যোতিপ্রকাশ মিরজি। মিরজির কথায়— খফিল দ্বারভাঙ্গার 'আল আজরা' বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করত আর মুসলমান যুবকদের কাছে জেহাদের কথা প্রচার করত। খফিল 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন'-এর সক্রিয় নেতা ইয়াসিন ভাটকল, মহসিন চৌধুরী সহ অন্য ছয় সন্দেহভাজন জঙ্গির ঘনিষ্ঠ ছিল— যারা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছিল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম সহ ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিস্ফোরণ ঘটাবার।

দুই জঙ্গি ধরা পড়ার আগে সব অকংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে রাজ্যে রাজ্যে 'এন সি টি সি' গড়ার কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাটাই ভেস্তে দিয়েছিল।

নীতিশজী রেগে গিয়ে বলেছেন, বিহার পুলিশকে না জানিয়ে এভাবে একতরফা গ্রেপ্তার করাটা ভুল, অবৈধ এবং চূড়ান্ত আপত্তিজনক। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের কাছে এবিষয়ে লিখিত প্রতিবাদ জানাবেন বলে প্রেসকে জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন— গ্রেপ্তারের ওই পদ্ধতি চূড়ান্ত আপত্তিকর। সবসময় দেশের প্রচলিত আইন মেনে চলা উচিত। নীতিশ কুমার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়াকে তাঁর ক্ষোভের কথা জানাবেন বলে জানিয়েছেন। বিহার রাজ্য পুলিশ প্রধান অভয়ানন্দ জানিয়েছেন— অন্য রাজ্যের পুলিশ খুব কম সময়ই আগেভাগে জানায়। ওই গ্রেপ্তারের ঘটনায় বিহার পুলিশকে একেবারে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। এমনকী দ্বারভাঙ্গার স্থানীয় থানাকেও জানানো হয়নি বা নথিভুক্ত করাও হয়নি।

প্রসঙ্গত, জেহাদি-মাওবাদী-সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ রোধে কেন্দ্র রাজ্য সমন্বয়ের বিষয়টি যে কথার কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা এই ঘটনায় আরও একবার প্রমাণিত হলো। এমনকী এরকম ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ রাজ্য অন্য কোনও রাজ্যের বা কেন্দ্রের সঙ্গে কতটা সহযোগিতা করবে তা নিয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে।

সংবাদ প্রতিবেদন

পাকিস্তানী সন্ত্রাসী হামলায় নিহত আমেরিকান পিছু ৫০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ওয়াশিংটনের সংবাদসূত্রে খবর, আমেরিকান কংগ্রেস পাকিস্তানের মদতে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত প্রতিটি আমেরিকানের মাথাপিছু পাকিস্তানের কাছে ৫০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা ধার্য করার এক চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। পাকিস্তানকে প্রদেয় আমেরিকান সাহায্যের অঙ্ক থেকেই এই টাকা উৎসস্থলে কাটা যাবে। কংগ্রেস সদস্য ডানা রোহরাবাফের বক্তব্য অনুযায়ী দীর্ঘ কয়েক দশক ধরেই পাকিস্তান চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের ভারত ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চালাতে সক্রিয়ভাবে মদত দিয়ে চলেছে। এই কাজ পাকিস্তানের মাটিতে আই এস আই-এর সক্রিয় সহযোগিতায় হচ্ছে বলেই রোহরাবাফের অভিমত। আমেরিকান কংগ্রেসে 'পাকিস্তান টেররিজম অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যাক্ট অফ ২০১২' নামের বিলটিকে তিনি এই মর্মে উত্থাপন করেন। এই আইন অনুযায়ী আমেরিকার প্রতিরক্ষা দপ্তরকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে নির্ভয়ে সক্রিয় থাকা আতঙ্কবাদীদের হাতে নিহত প্রতিটি আমেরিকানদের নথিভুক্ত করতে হবে। তাদের মৃত্যু যে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ মদতেই হয়েছে এ সম্বন্ধে কোনও দ্বিমত থাকবে না। এই কংগ্রেস সদস্য আরও দাবী করেন যে পাকিস্তানকে প্রস্তাবিত ২.২ বিলিয়ন ডলার অনুদানের অঙ্ক থেকেই মৃত আমেরিকান পিছু ৫০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ কেটে নেওয়া হবে এবং এই অর্থ নিহতের পরিবারকে প্রদান করা হবে।

আমেরিকার 'হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স ওভারসাইট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন সাব কমিটি'র চেয়ারম্যান হিসেবে রোহরাবাফার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই আমেরিকা পাকিস্তানের সরকারকে বিপুল অর্থ সাহায্য দিয়ে আসছে। অথচ আই এস আই এবং পাকিস্তানী সেনা মৌলবাদী চরমপন্থীগোষ্ঠীকে নির্দ্বিধায় মদত দিয়ে চলেছে যারা নিয়মিত আমেরিকানদেরই খুন করছে। আমেরিকা এই ব্যাপার আর বরদাস্ত করবে না।' এই মর্মে রোহরাবাফার রাখঢাক না করেই তাঁর ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'এই পাকিস্তানই তালিবান সৃষ্টির মূলে। তাদেরই গুপ্তচর বিভাগ ওসামা বিন লাদেনের মতো নৃশংস খুনীকে বছরের পর বছর আমেরিকার চোখে ধুলো দিয়ে সেদেশে লুকিয়ে রেখেছিল। আফগানিস্তানে এখনও অত্যন্ত বিপজ্জনক 'হাক্কানী নেটওয়ার্ক' সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিয়মিত আমেরিকান সৈন্যদের হত্যা করছে। তারা তো প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানী সরকারের অঙ্গুলি হেলনে চলে।' তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে মদত দেওয়ার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কু-অভ্যাসের উল্লেখ করে তিনি ভারতের কাশ্মীরে চলা আই এস আই তৎপরতা ও কার্যকলাপেরও নিন্দা করেন।

সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার ওয়েবসাইট উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ www.rssbangla.com — এই নামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার নতুন ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করলেন সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহনরাও ভাগবত। গত ১৪ মে কলকাতায় সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের প্রধান কার্যালয় কেশব ভবনের সভাগারে সঙ্ঘের কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকদের উৎসাহ ও আনন্দময় পরিবেশে ওয়েবসাইটির উদ্বোধন হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের সহ-প্রচার প্রমুখ ড. জিষ্ণু বসু। যেসব স্বয়ংসেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ওয়েবসাইটটি তৈরি হয়েছে, তাঁদের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তিনি।

বস্তুতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে স্বামীজীর কথা বৃহত্তর ক্ষেত্রে তুলে ধরতেই এই ওয়েবসাইট। এই উপলক্ষে একটি তথ্যচিত্রের কমপ্যাক্ট ডিস্কও মহানগর বৌদ্ধিক প্রমুখ শক্তিশেখর দাসের সম্পাদনায় তৈরি করা হয়েছে, সেটিও এদিন প্রদর্শিত হয়।

সঙ্ঘের ওয়েবসাইট উদ্বোধন করছেন মোহনরাও ভাগবত। রয়েছেন রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওয়েবসাইট উদ্বোধনের পর সরসঙ্ঘচালক মোহনজী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধশতবর্ষ আরও অনেকে পালন করছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ স্বামীজী যা বলেছিলেন তাই অবিকৃতভাবে সবার সামনে তুলে ধরতে চায়। স্বামীজীকে শুধু স্মরণ, পুনরায় তাঁর কথা উচ্চারণমাত্র নয়— অনুশীলন ও প্রত্যক্ষ আচরণে নিয়ে আসতে চায়। কিছু মহল থেকে স্বামীজীকে সেকুলার বলে দেখাবার প্রচেষ্টায় তিনি তীব্র আপত্তি জানান। নতুন ওয়েবসাইটটি আগামী বছরের প্রদেশের পক্ষে আয়োজিত বিবেকানন্দ যুব শিবিরের জন্য কার্যকরী হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত হয়।

সংবাদ প্রতিবেদন

অর্থ সঙ্কটে রাজ্যের উন্নয়ন স্তব্ধ

বর্ষপূর্তিতে ঢাক পেটাতে খরচ ২০ কোটি

নিজস্ব সংবাদদাতা।। কাজ কী হয়েছে তা বোধগম্য হচ্ছে না কারও। কিন্তু তার মধ্যেও ২০ কোটি টাকা খরচ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের বর্ষপূর্তি পালন করছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। একদিকে অর্থ সংকটের জন্য টাকা চেয়ে দিল্লির উপর যখন চাপ বাড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী তখনই নিজের সরকারের প্রচারের জন্য কোটি কোটি টাকা জলে দিতে তাঁর বিন্দু মাত্র গায়ে লাগছে না।

ঘটনাক্রম এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে গত ১৫ দিন ধরে কোনও দপ্তরের আর কাজকর্ম নেই। সকলেই মিলনমেলা প্রাঙ্গণে নিজেদের স্টল সাজানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সরকার পক্ষের ঘনিষ্ঠ নানা এজেন্সি এই সুযোগে এসে জুটছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য প্রচারে সাহায্য করার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা লুটে নেওয়া। মমতার সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল টানা ১৫ দিন মেলা বসবে। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মে মিলনমেলা প্রাঙ্গণ ভরানো যাবে না ভেবে শেষ পর্যন্ত তা সাত দিনে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গত ১২ মাসে কাজ কতটা হয়েছে কেউ জানে না। কিন্তু তিনটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে মূলত কুমীর ছানার মতো একই প্রকল্পের কথা বার বার দেখানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘোষণা করেছেন, যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ১০০ শতাংশ পালন করা হয়েছে। এক বছরেই সব কাজ হয়ে গিয়েছে।

বর্ষপূর্তিতে ১৩ মে পদযাত্রায় মমতা।

তবে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের মতে, গত এক বছরে মুসলিম তোষণ আর মন্ত্রী বিধায়কদের ভাতা বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই হয়নি। মুসলিম তোষণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। ইমামদের জন্য মাসিক ২৫০০ টাকা ভাতা দেওয়া, যারা মসজিদে আজান দেয় তাদের জন্য মাসিক ১ হাজার টাকা ভাতা, মুসলিম মহিলাদের জন্য সাইকেল বিলি, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাল্টা আরও একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গঠন, রাজারহাটে কেবলমাত্র মুসলিমদের জন্য একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নির্মাণের সূচনা করতে চলেছে এই সরকার। সংরক্ষণের নামে এরাজ্যে বসবাসকারী ৯৯ শতাংশ মুসলমানকেই অতি অনগ্রসর বলে চিহ্নিত করেছে মমতার সরকার। এই মর্মে মামলা পর্যন্ত হয়েছে। তাতেও বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করছে না সরকার।

অন্যদিকে মন্ত্রী-বিধায়কদের জন্য মোটা টাকা বেতন বাড়ানো হয়েছে। সরকারের প্রথম ছ'মাস তো মন্ত্রীরা বিধায়কভাতার টাকাও তুলে নিয়েছিলেন। অর্থ দপ্তরের আপত্তিতে তা ধরা পড়ে। এখন মন্ত্রীদের বিধায়কভাতা মাসে মাসে কেটে নেওয়া হচ্ছে।

এছাড়া সরকারি টাকায় মন্ত্রীদের মোচ্ছব তো চলছেই। সবমিলিয়ে গত এক বছরে মমতার সরকার কাজ কী করেছে তার বিচার হচ্ছে না। পর্যালোচনাও হচ্ছে না। জানলে অবাক হতে হয় যে পরিকল্পনা খাতে সরকারের বরাদ্দ টাকার মাত্র ৩০ শতাংশ খরচ করতে পেরেছে বিভিন্ন দপ্তর। তাতেই স্পষ্ট উন্নয়নের বেলায় অষ্টরম্ভা। সরকার প্রচারের ঢক্কানিনাদেই সব আড়াল করতে চাইছে।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর ''চিঠিপত্র'' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

— সঃ স্বঃ

বিশেষ প্রতিবেদন

ইচ্ছেমতো দাম বাড়ানো

ওষুধ কোম্পানীগুলির ২৪৬২ কোটি টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ওষুধের রাষ্ট্রীয় মূল্য নির্ধারণ কর্তৃপক্ষকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সিপলা, র‍্যানবক্সি, লাইকা প্রভৃতি কয়েকটি নামী ওষুধ কোম্পানী ইচ্ছেমতো ওষুধের দাম বাড়িয়ে ব্যাপকহারে মুনাফা কামিয়ে চলেছে। এরকম কাজ-কারবার বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলছে। এই তালিকায় প্রায় ৮০০-র মতো কোম্পানী রয়েছে, যারা গ্রাহকদের কাছ থেকে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে খেয়াল-খুশীমতো দাম নিয়ে মুনাফা করেছে। ভারত সরকারের 'ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি' (এন পি পি এ) দাম নির্ধারণের বিষয়টা আইনমাফিক দেখাশোনা করে। তবে এভাবে অনৈতিকভাবে দাম বাড়িয়ে জনগণকে প্রতারণা করার জন্য কয়েকটি ওষুধ কোম্পানীর উপর এন পি পি এ গত দশ বছরে ২৪৬২ কোটি টাকা জরিমানা ধার্য করেছে। কিন্তু আদায় হয়েছে এক দশমাংশেরও কম— ২২০ কোটি টাকা। অনেক ওষুধ কোম্পানী এন পি পি এ-র বিরুদ্ধে আদালতে গিয়েছে।

এন পি পি এ-র ওয়েবসাইটে প্রদত্ত তথ্য অনুসারে শুধুমাত্র সিপলা লিমিটেড-এর বাকির পরিমাণ ১,২৫১ কোটি টাকা। বিভিন্ন ওষুধ অনেক বেশি দামে বিক্রির অভিযোগ সিপলা'র বিরুদ্ধে। গত আটবছর যাবৎ সিপলা কোম্পানী আদালতে জরিমানার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

সূত্রমতে, ওষুধ তৈরি কোম্পানীগুলো প্রথমে নোটিশকে অবহেলা করে, তখন মামলা জেলা কালেক্টরদের কাছে যায়। সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্ট ওষুধ কোম্পানীগুলিকে এন পি পি এ-র বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার আগে অতিরিক্ত বিক্রয়মূল্যের ৫০ শতাংশ জমা করার নির্দেশ দিয়েছে। এখন দেখার— কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

অনিবার্য কারণবশতঃ গূঢ়পুরুষের কলম এবার প্রকাশিত হলো না। — স্বঃ স-

বকেয়ার বিস্তারিত বিবরণ

কোম্পানীর নাম	ফর্মুলেশন	অতিরিক্ত মূল্য সুদ (কোটি টাকায়)	আদায় হয়েছে
সিপলা লিমিটেড	ক্লোক্সাসিলিস ভিত্তিক ওষুধ	২৮.২২	—
সিপলা লিমিটেড	সাইপ্রোফোক্সাসিন ভিত্তিক ওষুধ	৩৩৪.২৪	—
সিপলা লিমিটেড	নরফ্লোক্সাসিন ভিত্তিক ওষুধ	৪২৫.৪৮	—
সিপলা লিমিটেড	সালবুটামল ভিত্তিক ওষুধ	৫১৮.৭১	—
সিপলা লিমিটেড	নরফ্লোক্স ভিত্তিক ওষুধ	৩৩.৭৮	—
লাইকা ল্যাবস্	ক্লোক্সাসিলিন ভিত্তিক ওষুধ	১১.৫১	—
ওকাসা লিমিটেড	ক্লোক্সাসিলিন ভিত্তিক ওষুধ	৬৫.০৭	—
ডাঃ রেড্ডিস্ ল্যাব	নরফ্লোক্সাসিন ভিত্তিক ওষুধ	২৮.৪৯	১০.৭১
র‍্যানব্যাক্সি ল্যাবস্ লিঃ	সাইপ্রোফ্লোক্সাসিন ভিত্তিক ওষুধ	৬১.৭১	—
র‍্যানব্যাক্সি ল্যাবস্ লিঃ	সাইপ্রোফ্লোক্সাসিন ভিত্তিক ওষুধ	৪৬.৯৪	২৩.৪৭
কেমওয়েল প্রা. লি.	ভেনট্রোলিন Exp/Sry	১০.১৫	৩.৮৬
লাইকা ল্যাবস্ লি.	ক্লোক্সাসিলিন ভিত্তিক ওষুধ	১১.৫১	—
ওয়েথ লি.	প্রেডনিসোলোন	১৭.২৬	১২.৮৭
কেমওয়েল প্রা. লি.	ভেনট্রোলিন Exp/Sry	১০.১৫	৩.৮৬
মোদি মুণ্ডি/টি সি হেলথকেয়ার	ইউনিকোরটিন সি আর ৪০০	৩৩.৭০	১৬.৫০
ওকাসা ফার্মা	নরফ্লোক্সাসিন	৮৪.৯৮	—
সিপলা/অ্যালকন	সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ইন	১১.৬০	—
ক্যাডিলা হেলথকেয়ার	ডেরিফিলিন	১০.৫১	—
এন আর জেট এন্টার প্রাইজেস	সাতটি ওষুধ	১৫.৯৯	—
সর্বমোট		২৪৬২.১৫ কোটি	২১৯.৪০ কোটি

রাজ্য রাজনীতি

ঘরে বাইরে কোণঠাসা সিপিএম

নিশাকর সোম

পরাজিত বিপর্যস্ত সিপিএমের বিরুদ্ধে ঘরে বাইরে বিদ্রোহ দেখা যাচ্ছে। রাজ্যের একটিও জেলা কমিটি নেই যেখানে জেলা সিপিএমের মধ্যে তীব্র দলাদলি দেখা যাচ্ছে না! সিপিএমের রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যেও বস্তুত আড়াআড়িভাবে দু'টি গোষ্ঠী রয়েছে। বর্ধমান-গোষ্ঠীকে কোণঠাসা করার জন্য রাজ্য-সম্পাদক বিমান বসু হাওড়া-মুর্শিদাবাদকে নিয়ে পাল্টা গোষ্ঠীকে মজবুত করছেন। সঙ্গে আছেন বিপর্যয়ের অন্যতম কাণ্ডারী পরাজিত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

সিপিএম রাজ্যনেতৃত্বের বিরুদ্ধে ত্রিফলকা আক্রমণ হানছেন— রেজ্জাক মোল্লা, অনিল বোস এবং অমিতাভ নন্দী। প্রথমেই রেজ্জাক মোল্লার কথাই ধরা যাক— যিনি নিজেকে 'চাষীর বেটা' বলেন, গায়ে গামছা জড়িয়ে থাকেন এবং অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ। নিচের তলার মানুষজন-কৃষক-ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। এই ধরনের জনদরদী নেতা আজ সিপিএমের রাজ্য-কমিটিতে আছে কি?

বিমান বসু রেজ্জাক মোল্লাকে 'মাইনাস' করার জন্য মুর্শিদাবাদ-এর প্রাক্তন জেলা সম্পাদককে রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে এনেছেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে উন্নীত করেছেন। কিন্তু মদন ঘোষও নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যকে মোকাবিলা করতে সক্ষম। উল্লেখ্য, মদন ঘোষকে প্রকাশ কারাত রাজ্য নেতাদের উপর নজরদারি করতে গোপন নির্দেশ দিয়েছেন।

বিমান বসুর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় খোঁচা হলো হুগলির অনিল বোস। ইনি তো বর্ধমান লবির লোক। এছাড়া হুগলি জেলাতে গোষ্ঠীবাজি করে যথেষ্ট কব্জা করেছেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী গাছের তলায় বসে প্রেস কনফারেন্স করে বিমান বসুর বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দিয়েছেন। এর পরেও তাকে কিন্তু আর ঘাঁটাবার সাহস পাচ্ছেন না বিমান বসু বুদ্ধদেব। 'মনীষা অন্তর্ধান' নিয়ে অনিল বোস কি সোচ্চার হচ্ছেন? হুগলি জেলার নতুন সিপিএম সম্পাদক সুদর্শন রায়চৌধুরীও কিন্তু বিমান বসু-কে পছন্দ করেন না। বিমানবাবুর আশা করি মনে আছে যে, সুদর্শন- বাসব ছাত্র ফ্রন্টে বিমান বসুকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন? সুদর্শনবাবুর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা কম থাকলেও, রাজনৈতিক তত্ত্বগত বিদ্যা বিমান বসুর থেকে কম নয়।

বিমান বসুর বিরুদ্ধে তৃতীয় খোঁচা হলেন— উত্তর ২৪ পরগণার অমিতাভ নন্দী। সুভাষ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর গোটা জেলায় অমিতাভ নন্দী দাপিয়ে কাজ করে গোষ্ঠীকে সবল করে তুলেছেন। নিচের তলার কর্মীদের কাছে গৌতম দেবের থেকে অমিতাভ নন্দীর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। গৌতমদেব মন্ত্রিত্ব করেছিলেন, কিন্তু জেলা পার্টি সংগঠনের কোনও কাজ করতেন না। মন্ত্রী হিসাবেও তিনি অত্যন্ত রূঢ় ও উদ্ধত ছিলেন। বিরোধী দলের নেতাদের খুশি করতে ব্যস্ত থাকতেন গৌতম দেব। পার্টির পুরানো কর্মীদের পাত্তাই দিতেন না। স্টান্টবাজিতে পারদর্শী গৌতম দেব বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পোড়া কাগজ দেখিয়ে বাজিমাৎ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উল্টে তিনিই কিস্তিমাৎ হয়েছেন। উত্তর ২৪ পরগণায় নিচের তলার অনেক কর্মীই মনে করেন, 'গৌতম দেব দূরদর্শনকে পার্টি সভ্যদের চেয়ে বেশি ভালবাসেন।' এ তো গেল বিমান বসুর ঘরের খোঁচা। বাইরের খোঁচা হলো সদ্য সমাপ্ত বামফ্রন্টের সভায় বিমান বসুকে কার্যত কোণঠাসা হতে হয়েছে। বিমান বসুর উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছে। পার্টির এই অবস্থায় যখন বামফ্রন্টকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা, তা না করে বিমান বসু আগুনে পেট্রোল ঢালছেন কেন? বিমান বসুকে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে যেতে হতে পারে।

বিমান বসুর একটি 'পকেট সংগঠন' হলো বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি। এঁর সাধারণ সম্পাদক হলেন বিমান-ভক্ত সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবর্তনের পর এই সমিতির মধ্যে একটা ঢেউ উঠেছে। বিমান বসুর তাতে সায় আছে। সুবীরবাবু তো প্রায়শই ক্ষিতি গোস্বামীর সঙ্গে সংযোগ রাখেন! সুবীরবাবুর 'কল্যাণে' এস আর সি (স্টেট রিসোর্স সেন্টার) আজ প্রকাশনা সংস্থায় পরিণত হয়েছে কেন? অনুসন্ধান করা হোক।

বামফ্রন্টের শরিকদল বিশেষ করে আর এস পি মনে করে মমতার নেতৃত্বাধীন সরকার প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছে। আর এস পি-র সাংসদ প্রশান্ত মজুমদার মহাকরণে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'মমতা কৃষক-দরদী, জনগণের নিবিড় সংযোগকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সেরা।' তিস্তা জলবন্টন নিয়ে মমতাকে তিনি আপসহীন নেত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, আর এস পি আজ ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। আর এস পি-র ট্রেড ইউনিয়ন নেতা দূরদর্শনের পর্দায় এবং সিপিএম-বিরোধী লেখা লিখে নিজের অস্তিত্ব জাহির করে থাকেন। তিনি কোনও ইউনিয়নকে ধরে রাখতে পারেননি। আর এস পি-র কৃষক সংগঠনের প্রবীণ নেতারা পার্টি ত্যাগ করেছেন। এছাড়া আর এস পি নেতৃত্বের একাংশ মমতা অনুরাগী। আর এস পি বর্তমানে সিপিএম থেকে দূরে থাকতে চায়। সিপিআই-ও সিপিএমের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে চাইছে না, সিপিআই-এর দাবি বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান পদ অবলুপ্ত করা হোক। সেইসঙ্গে বামফ্রন্টের কেন্দ্রীয় অফিসকে সিপিএমের কবজা থেকে বের করে ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে নিয়ে যাওয়ার দাবি তুলছে। বামফ্রন্টের দু'জন আহ্বায়ক করার দাবিও তোলা হয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লকেরও ভাঙা-হাট। নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা। সিপিএম অবশ্য ফরওয়ার্ড ব্লককে তোষামোদ করে চলেছে। সমস্ত বামপন্থী দলগুলির গণসংগঠনের গণচরিত্র নেই। সেগুলি পার্টির বিভাগীয় সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

সিপিএম তো গণসংগঠনের নেতা পার্টির 'বাধ্যকর্মী'কেই করে থাকে। গণসংগঠনের নিজস্ব দাবি-দাওয়া নেই। পার্টির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মার্শিনারি হতে হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে বাম গণসংগঠনগুলি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে যদি তৃণমূলীরা সংযত আচরণ করে। তৃণমূল যতই আক্রমণকারী আগ্রাসী হবে বামঐক্য ততই দ্রুত গড়ে উঠবে।

সিপিএম-রাজ্য নেতৃত্ব ব্যর্থ— ঘরে বাইরে কোণঠাসা। এই নেতৃত্বের দ্বারা পার্টির পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে না।

ইন্ডিয়া থেকে ভারতবর্ষের পথে..

ডঃ স্বরূপ ঘোষ

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল প্রায় ১০০০ বছরের বিদেশী বিধর্মী শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু মানুষের সর্বস্ব হারানোর বেদনাকে সঙ্গে নিয়ে। যখন স্বাভাবিকভাবেই খণ্ডিত ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বের হিন্দুর জন্মস্থান ও স্বাভাবিক জন্মভূমি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল তখন পশ্চিম ধাঁচের নিয়ম মেনে তৈরী হলো নাগরিকত্ব আইন। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের নির্যাতিত নিপীড়িত হিন্দুদের সামনে আজ ঘোর সংকট। প্রাণের দায়ে ধর্মান্তরিত হতে হচ্ছে তাঁদের। প্রাণ নিয়ে কোনও রকমে ভারতে চলে এলেও ফিরে যেতে বলা হচ্ছে অসহায় হিন্দু দরিদ্র মানুষগুলিকে। এদিকে বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশে ভারতবর্ষ ছেয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও অসম। জনবিন্যাসের চরিত্র এখনই অনেকক্ষেত্রে বদলে গেছে। হিন্দুর ভাগ জনসংখ্যার সমগ্র ভাগের মধ্যে ক্রমহ্রাসমান। খণ্ডিত ভারতবর্ষ পুনরায় দ্বিতীয়বার বিভক্ত হবার পথে এগিয়ে চলেছে। হিন্দু সমন্বয় চাইলেই সেটাই শেষ কথা নয়। মুসলমান সে দর্শনে বিশ্বাস করে কিনা সেটাও বোঝা জরুরি। ইতিহাস বলছে যবন ততক্ষণ সমন্বয়ের কথা বলে যতক্ষণ তারা নিজেরা সংখ্যালঘু। মুসলমানরা যে দেশে সংখ্যাগুরু সেখানে সংখ্যালঘুর অবস্থা করুণ সে কথা ভারতবর্ষের হিন্দু উদ্বাস্তু পরিবারগুলি মর্মে মর্মে জানে। সব ধর্মই সমান একথা হিন্দু যত সহজে রোজ বলে মুসলমান, খৃস্টান ধর্মগুরুরা তা বললে সমস্যাই অনেকটা কমে যেত। সৌদি আরবের মৌলবীরা বা রোমের পাদ্রীরা আমাদের সাধু সন্ন্যাসীদের মতো সর্বধর্মসমভাবের কথা বলছেন এমন শুনেছেন কি? পরবর্তী সময়ে ইজরায়েলের মানুষ যেমন ইহুদি হলেই আপন করে নিয়ে ইজরায়েলে স্থান করে দিয়েছে, ভারতবর্ষকেও হিন্দুর ক্ষেত্রে সেই নীতি না নিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। কারণ জনবিন্যাসের চরিত্র দ্রুত বদলাচ্ছে। ভারত তার হিন্দুপ্রধান চরিত্র হারালে এদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রও থাকবে না। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ কারণ তার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু। আজ যদি মুসলমানরা ভারতবর্ষে হিন্দুর ন্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হোত বহুকাল পূর্বেই তারা ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্র ঘোষণা করে দিত। পাকিস্তানের ন্যায় ধর্মাশ্রয়ী শাসন কায়েম হোত। বাংলাদেশের সমাজের মতো হিন্দুকে চুপচাপ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের অপমান সহ্য করে ক্লীবের মতো নিজ দেশে পরবাসী হয়ে থাকার রীতিতে রপ্ত হয়ে যেতে হোত। কোনও ধর্মনিরপেক্ষবাদী রাজনৈতিক নেতা বাঁচাতে পারত না। ভারতবর্ষকে এই ইন্ডিয়ার ন্যায় পশ্চিমী নিরীশ্বরবাদী মধ্যপন্থী আত্মঘাতী তথাকথিত উদারবাদের ধারায় দীক্ষা দিল নেহরু।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের বেদনা পাঞ্জাব ও বাংলায় সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছিল। কারণ এই দুই প্রদেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশগুলি ভারত ও পাকিস্তানে যুক্ত হয়েছে অবিভক্ত অবস্থায়। কিন্তু পাঞ্জাব ও বাংলা এই দুই প্রদেশের বিভাজন হয়েছিল। পূর্ব পাঞ্জাব হিন্দু ও শিখের ও পশ্চিম পাঞ্জাব পাঞ্জাবী মুসলমানের জন্য। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু বাঙ্গালী ও পূর্ববঙ্গ যা ১৯৪৭-এর পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ মুসলমান বাঙ্গালীর জন্য। আজ ২০১২-এ দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের ৩৩ শতাংশ হিন্দু ও ৬৭ শতাংশ মুসলমান। অখণ্ড বাংলা ভূমি-বিভাজন হিসাব করলে দেখা যাবে প্রায় ৩৩ শতাংশ জমি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আর ৬৭ শতাংশ জমি পেয়েছে বাংলাদেশ। দেশ ভাগের সময় হিন্দু বাঙ্গালী বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ৪৬ শতাংশ থেকে নেমে ৩৩ শতাংশ হয়েছে বর্তমানে। এখন ৪৬ শতাংশ হিন্দু বাঙ্গালী ৩৩ শতাংশ জমি পেলেও কল্পবিলাসী বাঙ্গালী হিন্দু জনবিনিময় করেনি। বাস্তব বুঝে পাঞ্জাবীরা ১৯৪৭-তে এই পাঞ্জাব প্রদেশে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে জনবিনিময় করে নিয়েছিল। অনুপ্রবেশ পশ্চিম সীমান্তে নগণ্য। পূর্বে বিপদ বাড়ছে। রাষ্ট্রবাদী শক্তির জনচেতনা মঞ্চ গড়ে দেশজুড়ে বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশের প্রকৃত চিত্রটি তুলে ধরা উচিত। ২০২০-র মধ্যে ভারতের বিশ্বশক্তিতে উত্তরণ ঘটবে। জনবিনিময় যা পূর্ব প্রান্তে ১৯৪৭-এ হয়নি ২০২০-২১-এ যাতে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী মুসলমানকে 'পুশ ব্যাক' করা যায় এ পথে রাষ্ট্রবাদী শক্তিকে প্রবল প্রচারে নামতে হবে। পূর্ববঙ্গের হিন্দু যদি তাতে এ দেশে চলে আসে ও তার ফলে ১৯৪৭ সালের জনবিনিময় ২০২০-২১-এ শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশকে বুঝিয়ে ভারত সম্ভব করতে পারে সে চেষ্টায় নামা উচিত। হাল ছেড়ে বসে থাকলে দেশটাই ভেসে যাবে বাংলাদেশের গর্ভে। আজ যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী নিরীশ্বরবাদী শক্তির নেতৃত্ব দেন তাঁরা বেশির ভাগই পূর্ববঙ্গের থেকে আগত উদ্বাস্তু হিন্দু পরিবারের সন্তান। যেহেতু তাঁরা বিশ্বাস করেন দেশভাগ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও বর্তমানে ঈঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিরামহীন আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি অভ্যস্ত তাঁরা সেপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। আবার সর্বস্বহারা হয়ে এসে সমবন্টন ছাড়া অন্য উপায় নেই। কিন্তু বন্টন সমান হতে গেলে ভাগাভাগিটাও ন্যায্য হতে হবে সেই বাস্তব সত্যটি অতি বাস্তববাদী প্রগতিশীলরা বোঝেন না তা নয়। বুঝেও বোঝেন না কারণ রাজনৈতিক স্বার্থে। ক্ষমতার লোভে সেই সত্য থেকে দূরে থাকাকে শ্রেয় মনে করেন। আগামীদিনে হিন্দু বঙ্গের পশ্চিমপ্রান্তে পূর্বের মতো গরিষ্ঠতা হারালে তাঁরাই ঐক্যবদ্ধ বঙ্গের দাবী তুলবেন সেটাই স্বপ্ন। সে বঙ্গ ভারতবর্ষের মধ্যেই থাক বা বাইরে সেটার চেয়ে অনেক বেশী তাঁরা চিন্তিত সেই বঙ্গের ক্ষমতার কতখানি তাঁদের হাতে থাকবে তা নিয়ে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল পাকিস্তানের সমর্থক। আজ তাঁরাই ক্ষমতা হারানোর আগে সংখ্যালঘু ভোটের স্বার্থে মুসলমানের জন্য সংরক্ষণ করে গেছে চাকরীতে। ভূ-ভারতে পশ্চিমবঙ্গেই

মুসলমানের জন্য চাকরীতে সংরক্ষণ সর্বাধিক। এদিকে হিন্দু বাঙ্গালী বিশেষ করে উদ্বাস্তু, নিম্ন আয়ের হিন্দু বাঙ্গালীর অবস্থা দেশভাগের ফলে শোচনীয়। সেদিকে নজর দেওয়ার সময় কেউ ভাবছে কি প্রদেশটাই না থাকলে উন্নয়নটা হবে কোথায়? প্রদেশটাই তো হাতছাড়া হতে চলেছে। ভারতের মধ্যে মুসলমানপ্রধান বাংলা থাকলে হিন্দু বাঙ্গালীর অবস্থা কাশ্মীরী হিন্দুর মতো হবে। আর কমিউনিস্টরা মুসলমান হয়ে সে বাংলার ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকার চেষ্টা করবে। তাদের কাছে ধর্ম পরিবর্তন তো নাম পরিবর্তন মাত্র। ধর্ম তো তাঁরা মানেন না। তাঁরা যখন পশ্চিমবঙ্গের শাসনে এসেছিলেন তখন একটি জেলা মুর্শিদাবাদ ছিল মুসলমান-প্রধান। যখন চলে গেলেন মালদা ও উত্তর দিনাজপুরও আজ মুসলমান-গরিষ্ঠ। একটি থেকে তিনটি জেলা। জনসংখ্যায় মুসলমানের অনুপাত কমিউনিস্ট শাসনকালে ২১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৮ শতাংশ হয়েছে। এ সম্ভব হলো পূর্ববঙ্গ থেকে অবাধ অনুপ্রবেশকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে। বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যা ২২ শতাংশ থেকে কমে ২ শতাংশ হয়েছে—কোথায় তখন বামপন্থী বিবেক? Once Hindu Bengaless had the entire Bengal. Now they have only West Bengal. By 2050 they will have only Bay of Bengal. সে গুজরাট নিয়ে এত নাটক লিখলেন বামপন্থী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা একবার দেখলেন না আর্থিক উন্নতির মানদণ্ডে গুজরাট কোথায় আর পশ্চিমবঙ্গ কোথায়? গুজরাট থেকে আর্থিক উন্নয়নের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ কত পিছনে। ভারতবর্ষের এই দুর্দশার জন্য দায়ী ইন্ডিয়ার স্বপ্নে বিভোর স্বধর্ম বিরোধী মানুষজন। নেহরু ভারতবর্ষকে ইন্ডিয়ায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা ছিল এমন কথা বলা খুব মুশকিল। Discovery of India বইতে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে কি পরিমাণ অস্বচ্ছ ছিল তার প্রমাণ হয়ে যাবে স্বামী বিবেকানন্দের Paper On Hinduism পড়ে, নেহরু'র what is Hinduism পাশাপাশি রেখে পড়লেই বোঝা যাবে। একজন মধ্যমানের নেতা স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁর ত্যাগও অতি সাধারণ স্তরের এবং প্রধানমন্ত্রিত্বে আসার পিছনে যে স্বার্থপরতার ইতিহাস তাঁর রয়েছে সে কথা আজ সকলেই জানেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র থেকে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের অকালে চলে যাওয়া ও নেহরুর নির্লিপ্ত ভূমিকা অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। তাঁর সরকারের অনৈতিক কার্যের কথাও তখনকার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যে স্বার্থচিন্তা নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন। নিজের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কারের দিবাস্বপ্নের লোভে সমগ্র হিন্দু জাতিকে যে চূড়ান্ত বিপদের মুখে ফেলে চলে গেলেন। ভুল কাশ্মীর ও তিব্বত নীতির মাশুল আমরা আজও গুণছি। এর সঙ্গে পারিবারিক পরম্পরার পরাকাষ্ঠায় তুলে দিয়ে গেলেন পুণ্যভূমিকে আর দেশের মধ্যপন্থী রাজনৈতিক মঞ্চটি যা হয় কংগ্রেস (ই), নয় কংগ্রেস হতে সৃষ্ট আঞ্চলিক শক্তি দ্বারা মূলত পরিচালিত তা পরিবারমুখী পরম্পরার মধ্যপন্থী মঞ্চ হলো। এই ধারা আঞ্চলিক অন্যান্য দলগুলিকেও গ্রাস করল। পরিবারমুখী রাজনৈতিক শক্তির উত্থানের রাজ দেখিয়ে গেলেন তিনি ও তাঁর কন্যা। কারণ যেখানে আদর্শগত টান দুর্বল সেখানে রক্তের সম্পর্কটিই শেষ ভরসা না হলে দল ধরে রাখাই দায়। সমাজবাদের নামেও যে দল উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় এসেছে যাঁরা আবার পশ্চিমবঙ্গে বামফন্টের শরিক তাঁরাও পরিবারবাদ ও জাতপাতকে সঙ্গে নিয়ে চলছে। সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। স্বাধীনতার পূর্বকালের মুসলিম লিগের দাবীগুলির সঙ্গে তাঁদের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। আজ বিশ্বে ভারত একটি অতি দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্রগুলির অন্যতম। যে বংশ ৬৪ বছর স্বাধীনতা উত্তরকালের ৫৪ বছর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসন করল তাঁরা এ দায় এড়াতে পারে? তাঁদেরই শাসনকালে পশ্চিমমুখী ইন্ডিয়ার ভক্ত যাঁরা একপুরুষে কোন যাদুবলে অতি সাধারণ অবস্থা থেকে রূপকথার মতো ধনকুবের হলেন তা দেশবাসীর জানতে বাকী নেই। ইন্টারনেট বলে দিচ্ছে। বাজারী পত্রিকা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টায় রত। কারণ মূল মধ্যপন্থী দলটির গুণমুগ্ধ বাজারী পত্রিকার অধিকাংশ মালিক। এঁদের আশীষ নিয়েই তো ফুলে ফেঁপে উঠা তাই মধ্যপন্থী রাজনৈতিক ও বাজারী পত্রিকার মালিকের এক সুর, এঁরা নিরীশ্বরবাদী পশ্চিমী ভাবধারার গুণগ্রাহী ও ইন্ডিয়ার সমর্থক। তাঁরা বাজারি কাগজে সকলের সমালোচনা করলেও নেহরু বংশের প্রতি অশেষ ভক্তি।

বামপন্থী সমাজতন্ত্রের অলীক স্বপ্নের তত্ত্বটি যে ১০০০ বছরেও পৃথিবী নেবে না তাঁরাও সে কথা জানে। বলতে পারছে না কারণ সারা জীবন যা বিশ্বাস করে এসেছে সোভিয়েত ইউনিয়ানের পতনের পর থেকেই বুঝেছে এ তত্ত্ব অন্তঃসারশূন্য। প্রায় একই সময় যাত্রা শুরু করে রাষ্ট্রবাদী শক্তি আজ দেশের প্রধান দুই শক্তির অন্যতম আর বামপন্থা এক প্রান্তিক শক্তি কখনও কংগ্রেস (ই)-কে ধরছে কখনও আঞ্চলিক দলগুলিকে। নিজের শক্তি নিয়ে ১০০ ছুঁতেই আরও ১০০ বছর লাগবে। তারপরও হবে না কারণ এখন তো ৫০ থেকেও নীচের দিকে যাত্রা। সাম্প্রতিক বিধানসভা ভোটে তো করুণ চিত্র নিদারুণ ভাবে ফুটে উঠেছে। তাই ইন্ডিয়ার সমর্থকরা ক্রমে হীনবল হবে। ২০২৫-এর মধ্যে সনাতন ভারতের সমর্থকরা তাঁদের সহযোগীদের নিয়ে ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হবে। পরিবর্তন আসতে চলছে ২০১৪-তে। আর ২০১৪—২০২৪ সময়কালে সমানে সমানে লড়াই। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রবাদের পক্ষে সরে আসবে অক্ষরেখা তখন সার্থক হবে ইন্ডিয়াকে ভারতবর্ষে উত্তরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্নের। তাঁর স্নেহধন্য রাজনৈতিক শক্তির ভক্তি রয়েছে সনাতন ভারতবর্ষে। দ্বন্দ্ব নয় দ্বন্দ্বাতীত অবস্থার দিকে এগোবার দর্শন যে ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্তে রয়েছে তাঁর প্রতি যাঁদের আস্থা এগিয়ে দিতে হবে সেই শক্তিকে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা আন্দোলন লড়েছিল ইন্ডিয়া হতে নয়— মহাভারত হতে। রামরাজ্যের স্বপ্ন নিয়ে। যেখানে রাজা হবেন সন্ন্যাসী। প্রকৃত সন্ন্যাসী সংসারে থাকবে কিন্তু তাঁর মধ্যে সংসার থাকবে না। সরল সাধারণ জীবন যাপন করবে। রামচন্দ্রের খড়ম রেখে রাজ্য শাসনের মতো সে শাসন করবে ভরতের মন নিয়ে। জীবই শিব এই সত্য জেনে ঈশ্বরের খড়ম থাকবে রাজসিংহাসনে। ভরতের ভাবে স্নাত হবে ভারত। সকলে যে যেখানে যে পদেই থাকবে সে ভাববে নিজেকে রামের প্রতিনিধি মাত্র। আসনটি রামের। ভারতের চিরকালের রাজা শ্রীরামচন্দ্র ও রাণী সীতামাতা। এই আমাদের

সনাতন ভাব। পিতৃপূর্বপুরুষের সংস্কার। ভারত রামের দর্শনটি বোঝার চেষ্টা করবে। রামে বিশ্বাস না থাকলে ভারতকেই চেনা যাবে না। রামরাজ্যে ত্যাগ ও প্রজা সেবাই প্রধান।

এই দুই ভাই অধ্যাত্মবাদের তত্ত্বে সিক্ত। রাষ্ট্রবাদের মঞ্চে যদি স্বার্থদীর্ণ কিছু লোকের প্রবেশ ঘটে তা মূল দর্শনটিকে অসত্য প্রমাণ করে না। রামায়ণ সদা সত্য।

রাষ্ট্রবাদের অর্থনীতিতে ধনীকে আরও ধনী হবার পথের দিশা দেখায় না। স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক সমাজতন্ত্রে মূল ভাবটিই ভারতীয় সনাতন ধর্মের অধ্যাত্মভাবের প্রকাশ মাত্র। ভারতে স্বদেশী মডেলের মাধ্যমে আর্থিক বিকাশের তত্ত্বে বিশ্বাস রাখতে হবে যেখানে গরীবের জন্য খাদ্য সুরক্ষার কথা থাকবে, সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে নিখরচায় শিক্ষার সুযোগ থাকবে, দেশ সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিল্প ছাড়া বেসরকারী সংস্থাকে অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে নীতি মেনে স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যবসা করতে দিতে হবে। Corporate Social Responsibility-র কথা জোরের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে যাতে Man-Making Mission যা স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন তার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়। শ্যামাপ্রসাদ বিবেকানন্দের গুরুভাই অখণ্ডানন্দের শিষ্যদের সাহায্যে যে রাষ্ট্রবাদী রাষ্ট্রীয় দলের পত্তন করেছিলেন তারমূল ভাবই ছিল ভারতীয়ত্ব ও মুক্তির পথ ছিল রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায়। আজ ভারতবর্ষের যে সকল রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী শ্যামাপ্রসাদের দলটি দুর্বল সে সকল রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোটের সমতুল্য রাষ্ট্রবাদী ভোটকে একজোট করতে হবে। আর যে সকল রাজ্যে তাঁরাই হয় প্রধান শক্তি নয় অন্যতম শক্তি সেখানে এককভাবে বা প্রয়োজনে রাষ্ট্রবাদী শক্তির প্রতি আস্থাশীল শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সরকার গঠনের প্রচেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সরকার গঠন হবার পর দরিদ্র নারায়ণ সেবার কথা মনে রাখতে হবে। হৃদিমন্দিরে ত্যাগ ও সেবা এই দুই ভাবকে প্রজ্বলিত রাখতে সনাতন ধর্মের অধ্যাত্মভাবে ডুব দিতে হবে।

প্রকৃত ভূমি সংস্কার, সমবায়ের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের সেবা, মন্দিরের সম্পদ লুঠ ও বেহাত হওয়া থেকে উদ্ধার করে তা দিয়ে মন্দিরকেন্দ্রিক টোলের পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে হিন্দুত্বের জাগরণ, দরিদ্রের জন্য স্বল্প সুদে ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন, বেসরকারিকরণ মানে দেশী-বিদেশী Monopoly সৃষ্টি নয়— মাঝারী ও বড় শিল্পের মধ্যে সমন্বয়। বড়লোক 'Trustees of the poor' এই তত্ত্বটি যেন রাষ্ট্রবাদীরা না ভোলেন। দক্ষিণপন্থা নয়, রাষ্ট্রবাদ স্বামীজীর অধ্যাত্মতত্ত্বে বলিয়ান হোক, রাজনীতিকে ধর্মনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। যাতে রাজনীতি বৈদিক ধর্মতত্ত্বের সাধনাটি উপলব্ধি করতে পারে।

বিবেকানন্দের শিবজ্ঞানে জীব সেবাকে বুঝতে গেলে অনাসক্ত ও মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কর্মযোগীর ভাবই রাখতে হবে রাষ্ট্রবাদীকে। বিবেকানন্দের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে রাষ্ট্রবাদকে এগোতে হবে অধ্যাত্মবাদের পথে ওঙ্কার মন্ত্র মুখে নিয়ে বৈদিক রথে গৈরিক পতাকাতলে।

ওঙ্কারের গৈরিক পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু জাতির জাগরণ দেখেছিলেন স্বামীজী। আমাদের সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে হবে জ্ঞান, প্রেম, কর্ম ও ভক্তি যোগের মাধ্যমে। সে পথেই হবে ইন্ডিয়া থেকে ভারতবর্ষে ফেরা।

নেত্রদান মহাদান

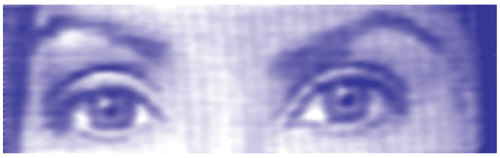

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®
নিখুঁত লেখার খাতা

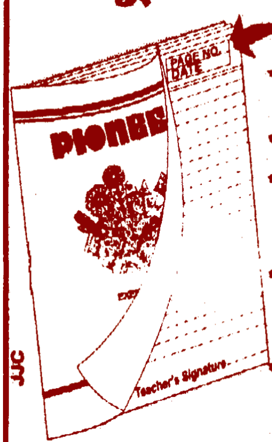

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature........................ কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

আমার অভিনেত্রী জীবন

বিনোদিনী দাসী

বিনোদিনী : রেখাচিত্র সত্যজিৎ

আমি গরীবের মেয়ে ছিলাম। থিয়েটার করতে যাবার আগে থিয়েটার কখনও দেখিনি। কি ক'রে যে থিয়েটারের মধ্যে পড়লেম, সেই কথাই বলি। সে অনেক দিনের কথা, তারিখ ঠিক মনে নেই। বাগবাজারের নিয়োগীবাবুদের বাড়ীর শ্রীযুক্তবাবু ভুবনমোহন নিয়োগী তখন গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক; আমি এঁরই থিয়েটারে প্রথম যাই। তখন আমার বয়স নয় কি দশ, এমনি হবে। আমাদের বাড়িতে গঙ্গাবাঈ ব'লে একজন বড় গায়িকা থাকতেন; ইনি কালে একজন বড় অভিনেত্রীও হয়েছিলেন! এঁর কথা পরে বলবো। স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ব্রজনাথ শেঠ দুজন ভদ্রলোক ''সীতার বিবাহ'' নামে একখানা নাটক খুলবেন ব'লে, এই গঙ্গামণিকে গান শেখাতে আসতেন। গঙ্গা তখনও পর্যন্ত কোন থিয়েটারে ঢোকেন নাই, এই বোধ হয় তাঁর প্রথম হাতে-খড়ি। তাঁরা যখন শেখাতেন, আমি খেলাধূলা ফেলে চুপটি করে বসে সে সব একমনে শুনতেম। এঁরাই একদিন আমাকেও খেলাঘরের হাঁড়ি-কুড়ি, হাতা-বেড়ীর মাঝখান থেকে টেনে নিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের নাচঘরের মাঝখানে ফেলে দিলেন। ছোট্ট মেয়ে, কিছুই জানি না, কখনও অতগুলি ভদ্রলোকের মাঝখানে এর পূর্বে যাইওনি; থিয়েটার যে কি জিনিস তাও জানি না। ভয়ে ভাবনায় লজ্জায় কেমন একরকম হয়ে গেলাম। ঠিক যেন হংস মধ্যে বক। আমার যাওয়ার কথাবার্তা পূর্ণবাবু ও ব্রজবাবু ঠিক করে দিলেন। গিয়ে দেখলেম, পরে জেনেছিলেম গ্রেট্ ন্যাশনালের দলে অভিনেত্রী আছেন সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা যাদুমণি, ক্ষেত্রমণি, নারায়ণী, লক্ষ্মীমণি, কাদম্বিনী আর রাজকুমারী। হায়! যাঁদের নাম করছি আজ তাঁরা কোথায়!

...আমার যাওয়ার পর বেণীসংহার নাটকের মহলা আরম্ভ হয়।

আমার প্রথম ''পার্ট'' এই বেণীসংহার নাটকে। একটি পরিচারিকা বা দাসীর ভূমিকা। দুই চারি ছত্র কথা। মুখস্থ করেছি, রিহার্সেলও দিয়েছি। বক্তব্য সামান্য; মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন, দুঃশাসনের রক্ত পান করে, সেই রক্তমাখা হাতে অভিমানিনী দ্রৌপদীর বেণী বাঁধতে আসছেন, এই খবরটি আমায় দ্রৌপদীকে দিতে হবে; দিতে হবে তো দিতে হবে; কিন্তু কে জানতো তখন যে এই সামান্য কথা ক'টা স্টেজে বেরিয়ে বলে আসার কি বিপদ, — অবশ্য প্রথম পার্ট নিয়ে বেরুনর দিন! সকলে যে যার ''পার্ট'' অভিনয় করে বেরিয়ে আসছে, শেষকালে এল আমার পালা! বেরুনর আগে বুকের ভেতর সে কি কাঁপুনি, ভয়ে তো জড়সড় হ'য়ে যাচ্ছি। অত লোকের সামনে বেরিয়ে বলতে হবে, এর আগে কখনও তো অত লোক একসঙ্গে দেখিনি!

গরীবের মেয়ে ছিলাম আমি। একটি ভাই ছিল, সে ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল। খুব অল্প বয়সে আমার বিয়ে হয়। আমরা জাত-বৈষ্ণব ছিলাম, চার-পাঁচ বছর বয়সেই আমাদের তখন বিয়ে হোত। আমারও তাই হয়েছিল। কিন্তু বিয়ে হয়েছিল এই পর্যন্ত; স্বামী কখনও গ্রহণ করেননি, তাঁকে আর কখনও দেখিওনি। বিয়ে দেওয়া একটা রীতি ছিল বলেই বোধহয় বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। মা তো ভাল করে প্রতিপালন করতে পারতেন না; পাড়ার অবৈতনিক স্কুলে কিছু-কিছু পড়তাম, আর খেলা করে বেড়াতাম। মা-ই জোর করে থিয়েটারে দিয়েছিলেন, যদি পেটের ভাত করে খেতে পারি এই জন্য।

পার্ট নিয়ে বেরুবার পূর্বমুহূর্তে কিন্তু পেটের ভাত চাল হয়ে গিয়েছে।... আমি তো উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছি, বোধহয় একটু বেরুতে দেরীও হয়ে থাকবে, ধর্ম্মদাসবাবু (গ্রেট্ ন্যাশনালের ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর) তাড়াতাড়ি এসে আমায় ঠেলে স্টেজের বা'র ক'রে দিলেন।

আমি বেরিয়েই দ্রৌপদীকে প্রণাম করে, হাত জোড় করে, যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই আমার বক্তব্য যা বলে গেলাম। খুব সাজপোষাক পরা গর্বিতা পাণ্ডব মহিষীর সামনে যেমন সঙ্কুচিত হয়ে বলতে হয়, তেমনি সঙ্কুচিত ভাব আপনি আমার হয়ে পড়লো। দর্শকদের দিকে ফিরেও চাইনি! কিন্তু তাঁরা আমার অবস্থা দেখে দয়া করেই হোক, কিম্বা যে কারণে হোক— আমার বক্তব্য শেষ হলে আমায় খুব হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিলেন। আমি কোনও রকমে কাজ সেরে পিছনে হেঁটে— ধর্ম্মদাসবাবু উইংসের পাশ থেকে আমায় সেই রকম করে চলে আসতেই বলেছিলেন, — ভিতরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। ধর্ম্মদাসবাবু আমাকে বুকের মধ্যে নিয়ে, আমার পিট চাপ্‌ড়ে বললেন, ''চমৎকার হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে''—ইত্যাদি। কত আশীর্বাদ করলেন। এখনও আমার ধর্ম্মদাসবাবুর সেই পিট্-চাপড়ান— সেই সস্নেহ আশীর্বাদ মনে পড়ে, আর চোখ সজল হয়ে ওঠে। প্রথম জীবনের কর্মসঙ্গী সব— হাত ধরে যাঁরা আমায় রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের আজ হারিয়ে বসে আছি! হাত-তালি পেয়ে আর ধর্ম্মদাসবাবুর মুখে 'বেশ হয়েছে' শুনে ভারি আহ্লাদ হলো। ধর্ম্মদাসবাবু বললেন, ''যা-যা পোষাক ছেড়ে ফেলগে যা।'' লাফাতে লাফাতে সাজ-ঘরে গেলাম। যেন দিগ্বিজয় ক'রে চ'লেছি। কার্ত্তিক পাল, আমাদের তখনকার ''ড্রেসার'' (বেশকারী) বললেন, ''আয় পুঁটি, আয়; বেশ হয়েছে।'' এই আমার অভিনেত্রী জীবনের প্রথম ''পার্ট''— একটি পরিচারিকার। এর পরে, কালে, কত রাণী সেজেছি, কত কি সেজেছি; কিন্তু জীবনের সুখ-স্বপ্নের মতো— এই 'ছোট্ট দাসীর' পার্টটির কথা মনে করতে আজ কত আনন্দই না হয়!

(বাংলা ১৩৩১ সালে বিনোদিনী 'রূপ ও রঙ্গ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'আমার অভিনেত্রী জীবন' নামে ধারাবাহিকভাবে নিজের স্মৃতিকথা লেখেন। যদিও লেখাটি সম্পূর্ণ হয়নি। এরই কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো।)

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে নটী বিনোদিনী

বিকাশ ভট্টাচার্য

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের আদি পর্বের প্রতিভাময়ী ও সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বিনোদিনী (১৮৬৩—১৯৪১)। যিনি নটী বিনোদিনী নামেই বেশী পরিচিত। এদেশে পাবলিক থিয়েটার গড়তে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে বিনোদিনী অন্যতমা। তাঁর অতুলনীয় অভিনয় ক্ষমতা, ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার এবং অভিনেত্রী-জীবনের নিষ্ঠা ও সাধনা সেকালে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যচর্চার ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। বারবনিতার ঘৃণ্যজীবন ও পরিবেশ থেকে এসে একেবারে বালিকা বয়সে বাংলার রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী হিসাবে যোগ দেন। ১২ বছর বয়সে মাসিক দশ টাকা বেতনে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ‘শত্রুসংহার’ নাটকে দ্রৌপদীর সখীর ছোট একটা চরিত্রে বিনোদিনীর প্রথম মঞ্চাবতরণ। সময়টা ১৮৭৪-এর ২ বা ১২ ডিসেম্বর। এখন যেখানে মিনার্ভা— সেখানেই ছিল এই গ্রেট ন্যাশনাল। স্বত্বাধিকারী : ভুবনমোহন নিয়োগী। সখীর পার্ট করতে করতেই পরের নাটক ‘হেমলতা’র রিহার্সাল শুরু হলো। এ নাটকে বিনোদিনীর নায়িকার ভূমিকায় প্রমোশন হলো। অর্থাৎ হেমলতার চরিত্রে। হেমলতার প্রথম অভিনয় ১৮৭৫-এর ৬ মার্চ। এরপর বিনোদিনীকে ফিরে তাকাতে হয়নি। শুরু হলো বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তাঁর জয়যাত্রা। গ্রেট ন্যাশনাল পশ্চিম ভারতে অভিনয়ের জন্য যায়। ১৮৭৫-এর মার্চ থেকে মে মাস লাহোর ও লক্ষ্ণৌ শহরে পর পর অভিনয় হয় ‘সতী কি কলঙ্কিনী’, ‘নবীন তপস্বিনী’, ‘সধবার একাদশী’, ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ এবং এই পর্যায়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন দীনবন্ধু মিত্রের ‘লীলাবতী’ ও ‘নীলদর্পণ’ নাটক দুটির মুখ্য চরিত্রে।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এরপর বিনোদিনী শরৎচন্দ্র ঘোষের বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দেন। মাসিক বেতনও বেড়ে গিয়ে হলো একেবারে ২৫ টাকা। এই বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৬-এর ২৩ ডিসেম্বর প্রথম অভিনীত হলো বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী। বিনোদিনী একই সঙ্গে আয়েষা, তিলোত্তমা ও আসমানি— তিনটি পৃথক চরিত্রে অভিনয় করে সকলকে অবাক করেন। এরপরই কপালকুণ্ডলা নাটকে একইসঙ্গে কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি দুটি ভিন্নধর্মী চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। একই নাটকে একাধিক ভূমিকায় অভিনয় করার রেকর্ড অবশ্য তাঁর ‘মেঘনাদ বধ’ নাটকে। এই নাটকে তিনি সাতটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। একই অভিনয় রজনীতে একাধিক বিপরীত ও বিরোধী চরিত্রেও তিনি অবলীলায় অভিনয় করেছেন। যেমন বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনী ও সধবার একাদশীতে কাঞ্চন। সীতা, প্রমীলা, দ্রৌপদী, রাধিকা, উত্তরা, দময়ন্তী, গোপা, চিন্তামণি প্রভৃতি পুরাণের নায়িকার ভূমিকায় চরিত্রগুলিকে যেমন তিনি জীবন্ত করে তুলতেন, তেমনই আবার কাঞ্চন, কামিনী, মনোরমা, কুন্দনন্দিনী, বিলাসিনী কারফরমা, রঙ্গিনী প্রভৃতি সামাজিক চরিত্রেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেন। অন্যদিকে আয়েষা, তিলোত্তমা, আসমানি, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র রূপায়ণেও তেজোদ্দীপ্ত স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম ছিলেন।

বেঙ্গল থিয়েটারে বিনোদিনীর অভিনয় ১৮৭৬-এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৭-এর অগাস্ট পর্যন্ত। এরপর বিনোদিনী তাঁর প্রকৃত গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর স্বল্পকালীন অভিনয় জীবনের শেষ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রের ছত্রছায়াতেই তিনি ছিলেন। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে ১ জানুয়ারি তাঁর শেষ অভিনয় ‘বেল্লিকবাজার’ নাটকে রঙ্গিণীর ভূমিকায়। এই পর্যন্ত তিনি ৫০টি নাটকে ৬০টিরও বেশি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তখনকার চারটি সাধারণ রঙ্গালয়ে— গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, ন্যাশনাল এবং স্টার থিয়েটারে তিনি অভিনয় করেছেন। বহু বিচিত্র চরিত্রের নানা প্রকাশে বিনোদিনী সে যুগে অসামান্য সাফল্য লাভ করেছেন। সাধারণ দর্শক থেকে বিদগ্ধ দর্শক, রুচিশীল দর্শক থেকে প্রমোদলোভী দর্শক সকলেই তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হতেন। রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, ফাদার লাঁফো, এডুইন আরনল্ড, কর্ণেল অলকট প্রমুখ দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান দর্শকেরও তিনি প্রশংসা অর্জন করেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও সে সময় তাঁর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। ১৮৮৪-এর ২৯ সেপ্টেম্বরের ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ মন্তব্য করে : The actor who took the part of Chaitanya seems to be gifted with considerable historic ability. ‘ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ’ ১৮৭৮-এর ৯ মার্চ মৃণালিনী নাটকে বিনোদিনীর অভিনয় সম্বন্ধে লেখেন : Saturday's performance of Mrinalini was favourably received by the audience...Srimati Binodini as Monorama in her ascension to the funeral pyre of her husband, carried us to the old days of sattee; and her last farewell address, together with the blaze of the lonely funeral pyre, contributed not a little to the solemnity of the seene.

এদেশে রেকর্ড-এর ব্যবসা শুরু হবার অনেক আগেই বিনোদিনী মঞ্চে অভিনয় করা ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি রেকর্ডিংয়ের অভিনয়াংশে অংশগ্রহণ করবেন না, এর কোনও যুক্তি নেই। জেনোফোন রেকর্ড কোম্পানী যখন এদেশে প্রথম এসেছে তখন নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করতে নটী বিনোদিনীর রেকর্ড প্রকাশ করে। বিল্বমঙ্গল, পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি বেশকিছু নাটক রেকর্ডে প্রকাশ পায়। পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে তাঁর আত্মনিয়োগ ও আত্মত্যাগ আজ ইতিহাস। ধনী যুবক গুর্মুখ রায় বিনোদিনীর গুণমুগ্ধ ও রূপমুগ্ধ ছিলেন। তাঁর দেওয়া ৫০ হাজার টাকার প্রলোভন তিনি ত্যাগ করেন এবং তাঁকে দিয়ে নতুন থিয়েটার খোলাতে রাজি করান। গুর্মুখ রায়ের শর্ত একটাই ছিল যে থিয়েটারের নাম হবে বিনোদিনীর নামে ‘বি-থিয়েটার’। কিন্তু তাঁরই সহশিল্পী ও শ্রদ্ধাভাজন কিছু ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে শেষ পর্যন্ত তাঁর নামে থিয়েটার হয়নি। বলতে গেলে তাঁরই অর্থে গড়ে ওঠা থিয়েটারের নাম হয় স্টার থিয়েটার। সেও এক বঞ্চনার কাহিনী। দীর্ঘ ইতিহাস।

থিয়েটারের কাছের মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় বিনোদিনী যখন দুঃখ বেদনায় দগ্ধ হতে হতে শান্তির আশ্রয় খুঁজছেন, তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন ‘চৈতন্যলীলা’ (১৮৮৪) দেখতে। চৈতন্যলীলায় বিনোদিনীর অভিনয়ে তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে অভিনয়ের শেষে গ্রীনরুমে এসে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। বিনোদিনীর অভিনয় জীবনে এ এক চরম প্রাপ্তি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, রামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণের বছরে অর্থাৎ ১৮৮৬-তে বিনোদিনী খ্যাতির চরম শিখরে থাকার সময়েই চিরদিনের মতো রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করেন। বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে যখন আরও অনেক কিছু তাঁর দেওয়ার ছিল তখন মাত্র ২২-২৩ বছর বয়সে তিনি মঞ্চাভিনয় ছেড়ে দেন। অথচ তার পরেও তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। বাংলা থিয়েটার বঞ্চিত হলো এক অসামান্যা অভিনেত্রীর উপস্থিতি, সহযোগিতা এবং প্রতিভা থেকে। গঠন পর্বে যার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি।

নটী বিনোদিনী : সমকালীন সমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা

অর্ণব নাগ

নারী আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে তখন। গৃহান্তরালে অসামান্যাকে গৃহের ঘেরাটোপে বন্দী করে না রেখে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত করানোর তাগিদ সেই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর 'স্ত্রী-শিক্ষা' 'নারীর অধিকার', 'বাল্য-বিবাহ রোধ' ইত্যাদি ব্যাপারে ব্রাহ্মরা যে সর্বদাই অগ্রণী ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। ১৮৮৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ সশিষ্য বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে গিরীশ ঘোষের 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখতে আসেন। এরপর চৈতন্যরূপী নটী বিনোদিনীর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদপ্রাপ্তি যে ঐতিহাসিক দিকচিহ্নের সূচনা করেছিল সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। যাই হোক, ওইদিনের পর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সখ্যতা ও ঘনিষ্ঠতার শুরু। আর এই রঙ্গমঞ্চের পুরোধা পুরুষ গিরীশচন্দ্র ঘোষ রামকৃষ্ণের কাছে 'নমস্কার' প্রতিযোগিতায় হেরে কম্বুকণ্ঠে 'রামকৃষ্ণ-অবতারে প্রণাম-অস্ত্র দিয়ে জগৎ-জয় হবে' ঘোষণা করে 'ভক্ত-ভৈরবে' রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তখন ব্রাহ্ম-নেতা কেশবচন্দ্র সেন মারা গিয়েছেন। তাঁর মাধ্যমেই মূলতঃ ব্রাহ্মদের সঙ্গে রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত হয়েছিল ১৮৭৫ সালে বেলঘড়িয়ায় জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়িতে। এবং রামকৃষ্ণদেব যে একজন উচ্চ-আধ্যাত্মিক পুরুষ তা ব্রাহ্মরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

এখন বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতায় তাঁর সম্পর্কে ব্রাহ্মদের কিরকম মনোভাব হলো তার জন্য দু'টো উদাহরণ দিই। প্রখ্যাত নাট্যলেখক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভক্তভৈরব গিরীশচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন, ''ব্রাহ্মসমাজে অনেকে ঠাকুরের সংশ্রবে আসা বন্ধ করে দিলেন। কেশব সেন তখন দিব্যধামে গিয়াছেন, বিজয়কৃষ্ণ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিলেন কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আর আসিতেন না। তিনি এত ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করিতেন যে, অনেকে প্রশ্ন করিতেন, 'আপনি ঠাকুরের কাছে যান না কেন?' শিবনাথ শাস্ত্রী— যাব কি, থিয়েটারের হীনচরিত্র লোকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, ওখানে আর আমাদের যাওয়া চলে না।'' 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে'র লেখক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে (১৮.০৫.১৯৭৯) সেন্ট লুই বেদান্তমঠের

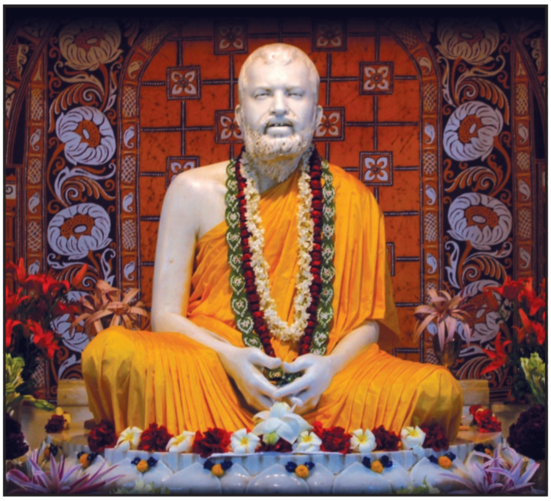

বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ একটি মূল্যবান সংবাদ পরিবেশন করেন, ''আমি (চেতনানন্দ) প্রভবানন্দজীর মুখে শুনে Diary-তে লিখেছিলাম : প্রতাপ মজুমদার (ব্রাহ্মভাই, কেশব সেনের অনুগামী) ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে দেখা করে বলেন, Ramkrishna ভাল লোক ছিলেন; কিন্তু শেষের দিকে Prostitute (বেশ্যা) [পড়ুন নটী বিনোদিনী] ও Drunkard (মাতাল) [পড়ুন গিরীশ ঘোষ]-দের সঙ্গে মিশে Mixed up হয়ে যান। ম্যাক্সমুলার শুনে আনন্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে বলেন, এতেই প্রমাণ হয় তিনি অবতার। যীশুও ওইরূপভাবে পতিতদের উদ্ধার করেছেন।''

পুরো বিষয়টা এখানে এজন্যই উদ্ধৃত করলাম যেহেতু প্রদীপের নিচের এই অন্ধকারটুকু না জানলে সমাজ-পরিবর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা বোঝা সম্ভব নয়। 'নারী-স্বাধীনতা' নিয়ে যে ব্রাহ্মরা ছিলেন অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত, সামাজিক অবহেলা আর শোষণে যে নারীরা বাধ্য হয়েছিলেন ভিন্ন ধরণের জীবিকার সন্ধান করতে তাঁদের সম্পর্কে ব্রাহ্মদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল তা বোঝাই যাচ্ছে। আর এই নারীদের সম্বন্ধে যখন খোদ ব্রাহ্মদেরই এহেন অভিমত, তখন সমাজে এঁদের স্থান কোথায় ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এই প্রসঙ্গ প্রখ্যাত নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য, ''সাধারণত লোকের বিশ্বাস, বিশেষত থিয়েটারের প্রথম যুগে অনেকেরই ধারণা ছিল যে যাহারা থিয়েটার করে তাহার 'পারিয়া', তাহারা একঘরে; কারণ— গিরিশচন্দ্রই বলিয়াছিলেন 'বারাঙ্গনা সহচরী, কে কোথায় রাখে তার মান?' কিন্তু ওই মান রাখিয়াছিলেন, আর কেহ নহেন, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী (রামকৃষ্ণদেব)। তিনি এই বাঙ্গালাদেশের কোন পতিতা অভিনেত্রীর (নটী বিনোদিনী) মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন 'তোমার চৈতন্য হোক।' '' ('রূপ ও রঙ্গ', ১৮ মাঘ, ১৩৩১)। ফলতঃ উনিশ শতকের যে নারী জাগরণের কৃতিত্বটা ব্রাহ্মদের দেওয়া হয়, সেই জাগরণ যে ছিল নেহাতই একতরফা তা আশা করি পাঠক অনুধাবন করতে পারছেন। এই কৃতিত্বের সিংহভাগই যে রামকৃষ্ণদেবের প্রাপ্য তা নিঃসংশয়ে বলা চলে। আর এই নারী জাগরণের হাত ধরেই যে সমাজ পরিবর্তনের ঢেউ উঠেছিল (যার ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকের 'বারাঙ্গনা' নটী বিনোদিনী আজ একুশ শতকে 'বীরাঙ্গনা'য় পরিণত), তাতে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের অবদান তো অবিসংবাদিত।

একথা যদিও আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ স্বয়ং নটী বিনোদিনী-ই বলেছেন, ''জগৎ যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাতেও

আমি ক্ষতি বিবেচনা করি না। কেননা আমি জানি যে পরমারাধ্য পরমপূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমায় কৃপা করিয়াছিলেন! তাঁর সেই পীযূষপূরিত আশাময়ী বাণী,— 'হরি গুরু গুরু হরি' আজও আমায় আশ্বাস দিতেছে। যখন অসহনীয় হৃদয়ভারে অবসন্ন হইয়া পড়ি, তখনই যেন সেই ক্ষমাময় প্রসন্নমূর্তি আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলেন যে 'বল— হরি গুরু গুরু হরি'।" (আমার কথা ও অন্যান্য রচনা, বিনোদিনী দাসী, সুবর্ণরেখা সংস্করণ, পৃঃ ৪৪)।

এবার চৈতন্যলীলা অভিনয় প্রসঙ্গে আসা যাক। যে নাটক সম্পর্কে গিরীশচন্দ্র বলেছিলেন, 'ওই চৈতন্যলীলাই আমার সব— ও থেকেই আমি গুরুকৃপা লাভ করলুম।' পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, ১৮৮৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ সশিষ্য বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে এই অভিনয় দেখতে আসেন। তখনকার দিনে নটীদের সম্পর্কে ধারণার ভিত্তিতে সাধারণ মানুষকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। একদল মনে করতেন এঁরা হলেন দেহোপজীবিনী, ভোগের পাত্রী; আর অপর একদলের (এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ) কাছে নটীরা ছিলেন অচ্ছুৎ। এছাড়া আরও একদল মানুষ ছিলেন, যাঁরা এঁদের নারীত্বের মর্যাদা দিতে চাইতেন, তেমন মানুষ নটী বিনোদিনীর জীবনেও এসেছিলেন, কিন্তু এঁদের সংখ্যা ছিল নেহাত-ই হাতে গোণা। এহেন নগন্যা এক নটীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ কেমন ছিল, তবে শুনুন। আইনজীবী শ্রীকৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (নাটুবাবু) আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে বিনোদিনীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রবীণ এই আইনজীবীর মুখে শুনেছিলেন 'চৈতন্যলীলা' অভিনয়ের পরবর্তী ঘটনা। যে ঘটনাটি নাটুবাবু স্বয়ং বিনোদিনীর মুখেই শুনেছিলেন। বিনোদিনী তাঁকে জানিয়েছিলেন, অভিনয় চলার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং তাঁকে স্টেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভক্তদের বারবার বলতে থাকেন। এই অবস্থায় থিয়েটার শেষ হয়। বিনোদিনী তাঁর জন্য অফিসঘরে অপেক্ষা করছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে প্রবেশ করেই ভাববিষ্ট অবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গবেশি বিনোদিনীর পায়ের ওপর পড়েন।

তবে শ্রীরামকৃষ্ণ বিনোদিনীর পাদস্পর্শ করার আগেই ভক্তরা তাঁকে ধরে ফেলেন। সেদিন স্টার থিয়েটারে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ঠাকুরের শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ (কালী বেদান্তী)-র মুখে এই কথাটি শুনেছিলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। বিষয়টার ইঙ্গিত দিয়েছেন গিরীশ ঘোষও— অনেক সাধুব্যক্তি ভাবাবেশে তাহার (বিনোদিনীর) পদধূলি লইতে অগ্রসর ('পুরুষ অংশে নারী অভিনেত্রী')। যদিও বিনোদিনীর ধারণা ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পদস্পর্শ করায় যে পাপ হয়েছিল সেজন্যই তাঁর সারা গায়ে শ্বেতী বেরোয়। ভাবুন, যাঁর পদতলে একদিন জগৎ-সংসার লোটাবে, তিনিই স্বয়ং কিনা

'বিবাহ বিভ্রাট' প্রহসনে বিলাসিনী কারফর্মার বেশে বিনোদিনী।

এক সামান্যা 'পতিতা' নারীর পায়ে পড়তে গিয়েছিলেন! নারীত্বের এই মর্যাদা ইতিপূর্বে আর কোনও মহাপুরুষ দিয়েছেন কি না, কিংবা ভবিষ্যতেও আর কেউ দেবেন কিনা তা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। শ্রীম প্রণীত 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত'-এর সৌজন্যে আমরা জানি, থিয়েটারে বেশ্যারা অভিনয় করে শুনে ঠাকুর বলেছিলেন, আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখবো। আর অভিনয়ে তাদের চৈতন্যদেব, নিতাই ইত্যাদি সাজা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।" ঠাকুরের সেই অমোঘ বাণী, 'থ্যাটারে লোকশিক্ষে হয়' এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। নিজের আত্মজীবনী 'আমার কথা'য় এনিয়ে একটি শ্রুতিনন্দন দৃশ্য এঁকে গিয়েছেন স্বয়ং বিনোদিনী-ই, "আমার জীবনের মধ্যে চৈতন্যলীলা অভিনয় আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে আমি পতিতপাবন পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম। কেননা সেই পরম পূজনীয় দেবতা, চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া আমায় তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন! অভিনয় কার্য্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণ দর্শন জন্য যখন আপিস ঘরে তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইতাম, তিনি প্রসন্ন বদনে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতেন : "হরি গুরু, গুরু হরি", বল মা "হরি গুরু, গুরু হরি", তাহার পর উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার পাপ দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, "মা তোমার চৈতন্য হউক।" তাঁর সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময় মূর্তি, আমার ন্যায় অধম জনের প্রতি কি করুণাময় দৃষ্টি! পাতকীতারণ, পতিতপাবন যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমায় অভয় দিয়াছিলেন। হায়! আমি বড়ই ভাগ্যহীনা অভাগিনী! আমি তবুও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। আবার মোহ জড়িত হইয়া জীবনকে নরকসদৃশ করিয়াছি।"

এই প্রসঙ্গে একটি ব্যতিক্রমী বর্ণনা রয়েছে অক্ষয়কুমার সেনের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' ('ভক্তদের সঙ্গে নানা রঙ্গ' অধ্যায়)-তে। যাতে জানা যায় রামকৃষ্ণদেবের ভাবাবেশে শ্যামাসঙ্গীত শুনে তাঁর চরণে ভাবে অচৈতন্য হয়ে পড়েন বিনোদিনী। বর্ণনাটি এরকম :

"দেখিয়া শ্রীপ্রভুদেব ভাবে ভরা চিত।
ধরিলা মোহন কণ্ঠে শ্যামা-গুণগীত।।
মধুর প্রভুর স্বর পিকপাখি জিনি।
শ্রবণে মোহিতচিত যতেক রমণী।।
তার মধ্যে একজন বিনোদিনী নাম।
মূর্ছিতা হইয়া পড়ে ধরায় অজ্ঞান।।
প্রসারিত ঠাকুরের শ্রীচরণতলে।
দিব্যভাব সমুদিত অন্তর অঞ্চলে।।"

বিনোদিনী রঙ্গমঞ্চে এসেছিলেন ১৮৭৪ সালে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১১। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে আলাপ তাঁর অভিনয় জগতে আসার ঠিক দশ বছর পরে, ১৮৮৪ সালে। ১৮৮৬ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে বিনোদিনী'র রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ। আর ওই বছরই রামকৃষ্ণদেবের ইহলোক ত্যাগ। এই দুই ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র থাকা অসম্ভব কিছু নয়। কারণ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ত্যাগের পরও অর্ধশতাব্দী-রও বেশি সময় জীবিত ছিলেন বিনোদিনী। কিন্তু ওই দীর্ঘ সময়ে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেননি অতীত দিনের মঞ্চসম্রাজ্ঞী বিনোদিনী। তবে এ-সংক্রান্ত পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি খুব একটা জোরালো নয়। একথা অনস্বীকার্য যে, বারো বছরের অভিনয় জীবনের (১৮৭৪---১৮৮৬) মাত্র শেষ দু'বছর (১৮৮৪---১৮৮৬) বিনোদিনী-র সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত হলেও বিনোদিনীর জীবনে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম।

বিনোদিনীর সঙ্গে একই বাড়িতে অনেকদিন কাটিয়েছিলেন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের আরেক প্রথিতযশা অভিনেত্রী তারাসুন্দরী। তারাসুন্দরীর কন্যা প্রতিভা খান্না বিনোদিনীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন। সেই সূত্রে একটি চমকপ্রদ তথ্য পরিবেশন করেছেন তিনি, "থিয়েটারে তিনি (বিনোদিনী) যে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, বলতেন সেদিনের ঘটনা। তাঁর নিজের বাড়ির তিন তলায় ঠাকুরঘর করেন, সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন রাধাকৃষ্ণ-মূর্তি, গোপাল ও শালগ্রামশিলা। রাধাকৃষ্ণের পূজা করতে আসতেন পুরোহিত। সেই ঠাকুরঘর বাদেও বিনোদিনীর নিজস্ব একটি ছোট ঘর ছিল— তাঁর নিজস্ব পূজাগৃহ। সেখানে ছিল শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের পট। এখানে পূজা করতেন তিনি নিজে। গীতাপাঠ করতেন, আহ্নিক করতেন--- শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করতেন ফুল-চন্দনাদি দিয়ে।" (বিবৃতি- শঙ্করীপ্রসাদ বসু অনুলিখিত)।

বিনোদিনীর সুদীর্ঘ ৭৮ বছরের (১৮৬৩—১৯৪১) জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি মাত্র দু' বছরের। তবুও বিনোদিনীর জীবনকে বুঝতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের আলোতেই তা বুঝতে হবে। যে সহৃদয় পুরুষের সান্নিধ্যে বিনোদিনীর নারীত্ব মর্যাদা পেয়েছিল এবং যে একটিমাত্র কন্যা (শকুন্তলা) বিনোদিনীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিল--- এঁদের অকালমৃত্যু বিনোদিনীর হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁকে শেষ বয়সে সন্ধ্যায় নিয়মিত দেখা যেত বেদান্ত মঠে স্বামী অভেদানন্দের কাছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ দেখেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের পটের সামনে আকুল হয়ে কাঁদছেন একদা বঙ্গরঙ্গমঞ্চের দোর্দণ্ডপ্রতাপ অভিনেত্রী নটী বিনোদিনী। (তথ্যসূত্র— শ্রীরামকৃষ্ণ : বিনোদিনী :বঙ্গরঙ্গমঞ্চ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, উদ্বোধন : পুরাতনী ২০০৬ বিশেষ সংখ্যা)। এ-সংক্রান্ত গবেষক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বিনোদিনীর কী কী অভিনয় দেখেছেন তার একটি তালিকা দিয়েছেন। সেই তালিকা অনুযায়ী বিনোদিনী অভিনীত গোটা ছ'য়েক নাটক স্টার থিয়েটারে দেখতে আসেন রামকৃষ্ণদেব (সারণি দ্রষ্টব্য)। অসুস্থ অবস্থায় শ্যামপুকুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিনোদিনীর অন্তিম সাক্ষাৎকারটি অত্যন্ত কৌতুককর। 'আমার কথা'য় বিনোদিনী লিখেছেন, "আরেকদিন যখন তিনি অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরের বাটিতে বাস করিতেছিলেন, আমি শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই তখনো সেই রোগাক্রান্ত প্রসন্ন বদনে আমায়ে বলিলেন 'আয় মা বোস।' আহা কী স্নেহপূর্ণ ভাব! এ নরকের কীটকে যেন ক্ষমার জন্য সতত আগুয়ান।" ব্যাপারটা অত সহজে হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কণ্ঠরোগে আক্রান্ত। সময়-অসময়ে ঠাকুরের কাছে গিয়ে যে কেউ যেন তাঁকে না বিরক্ত করতে পারে সেইজন্য কড়া প্রহরায় ছিলেন ঠাকুরের ভক্তরা। এই পরিস্থিতিতে রক্ষকের ভক্ষকরূপ ধারণ করে থিয়েটার জগতে ঠাকুরের আরেক পরমভক্ত কালীপদ ঘোষ (দানাকালী) কিভাবে অন্যান্য রক্ষী-ভক্তদের চোখকে ফাঁকি দিয়েছিলেন তার একটি মনোমুগ্ধকর বিবরণ রয়েছে স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'লীলাপ্রসঙ্গে'। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র বর্ণনা— "সে (বিনোদিনী) তাঁহাকে (রামকৃষ্ণদেবকে) সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত এবং আর এক দিবস তাঁহার পুণ্যদর্শন লাভ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। ঠাকুরের নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া সে এখন তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষের সহিত পরিচিত থাকায় বিশেষ অনুনয় বিনয়পূর্বক ওই বিষয়ের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইল।... গোপনে পরামর্শ স্থির করিয়া একদিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি তাহাকে পুরুষের ন্যায় 'হ্যাট-কোটে' সজ্জিত করিয়া শ্যামপুকুরের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজ বন্ধু বলিয়া আমাদিগের নিকট পরিচয় প্রদানপূর্বক ঠাকুরের সমীপে লইয়া যাইয়া তাহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। ঠাকুরের ঘরে তখন আমরা কেহই ছিলাম না, সুতরাং ওইরূপ করিবার পথে তাঁহাকে কোনও বাধাই পাইতে হইল না। আমাদিগের চক্ষে ধূলি দিবার জন্যই অভিনেত্রী ওইরূপ বেশে আসিয়াছে জানিয়া রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন এবং তাহার সাহস ও দক্ষতার প্রশংসাপূর্বক তাহার ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ঈশ্বরে বিশ্বাসবতী ও তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিবার জন্য তাহাকে দুই-চারিটি তত্ত্বকথা বলিয়া অল্পক্ষণ পরে বিদায় দিলেন। সেও অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে তাঁহার শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শপূর্বক কালীপদের সহিত চলিয়া যাইল। ঠাকুরের নিকট হইতে আমরা পরে একথা জানিতে পারিলাম এবং আমরা প্রতারিত হওয়ায় তিনি হাস্য-পরিহাস ও আনন্দ করিতেছেন দেখিয়া কালীপদের উপরে বিশেষ ক্রোধ করিতে পারিলাম না।"

রসরাজ অমৃতলাল বসু যথার্থই লিখেছেন, "সেই প্রথম যখন দীনা অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে শ্রীচৈতন্যের বেশে নদীয়ার ঈশ্বরাবতারের লীলা অভিনয় করিয়াছে, তখন আমাদিগের হীন রঙ্গালয়কে বৈকুণ্ঠে উন্নত করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রকটিত ঈশ্বরের অন্য অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই অভিনয় বসিয়া দেখিয়াছেন; আমরা ধন্য হইয়াছি, দর্শক ধন্য হইয়াছেন, বসুমতী ধন্যা হইয়াছেন!!!" আজ যুগ পাল্টেছে। নটী বিনোদিনীর যুগে একজন অভিনেত্রীকে যে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হোত, আজ সেই অভিনেত্রীরাই সমাজের সম্ভ্রম, কুর্নিশ আদায় করে নিচ্ছেন। নারী এখন অনেক 'স্বাধীন'। সামগ্রিকভাবে এনিয়ে সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে বললে কম বলা হবে, আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আর এই পরিবর্তনের কৃতিত্ব যে উনিশ শতকের কোনও সমাজ-সংস্কারকের নয়, দক্ষিণেশ্বরের সেই প্রবাদ-প্রতিম সাধুটিরই তা না বললেও চলে।

ঋণাঞ্জলি : শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ওপর গবেষণা করে যিনি সমাজ- পরিবর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকার ব্যাপারে নবদিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন, সেই শ্রদ্ধেয় গবেষক-অধ্যাপক প্রয়াত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি।

সারণি

	শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা নাটক	বিনোদিনীর ভূমিকা	আকর তথ্যসূত্র
(১)	চৈতন্যলীলা	চৈতন্য	'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', শ্রীম
(২)	প্রহ্লাদচরিত্র	প্রহ্লাদ	তদেব
(৩)	বৃষকেতু	পদ্মাবতী	তদেব
(৪)	নিমাইসন্ন্যাস	নিমাই	'গিরীশচন্দ্র', অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
(৫)	দক্ষযজ্ঞ	সতী	'লাটু-মহারাজের স্মৃতিকথা', চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত', বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল
(৬)	বিবাহ-বিভ্রাট প্রহসন	বিলাসিনী কারফর্মা	'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', শ্রীম

চিঠিপত্র

হিন্দু বিবাহ আইন

খবরে প্রকাশ যে যদি কোনও প্রতিষ্ঠান জাতি, লিঙ্গ বা ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করে, তা প্রমাণিত হলে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার আইন হবে। এই মর্মে সংশোধনী বিল কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ মন্ত্রীর দপ্তর পেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু সরকার কেন আইন বলবৎ করে বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং সে আইন বাতিল করে বৈষম্য দূর করে না? প্রসঙ্গত নিবেদন এই যে কেবলমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে বড় ধরনের বৈষম্যমূলক আইন সামাজিক ক্ষেত্রে বলবৎ আছে তা বাতিল করা ভারতীয় সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক।

১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন হলো একটি উদাহরণ। এই আইনে একজন হিন্দু একাধিক বিবাহ করলে ৭ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে অথচ একজন মুসলমান একই সঙ্গে চারটি এমনকী পাঁচটি বিবাহ করলে ৫ম বিবাহটিও অবৈধ হবে না। এই বৈষম্যমূলক আইন আজও বলবৎ আছে। ১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইন কংগ্রেস সরকার তৈরি ও বলবৎ করেছে। এই বৈষম্যমূলক আইন বাতিল হলে বৈষম্যমূলক হিন্দু-বিরোধী ব্যবস্থা দূর হবে। সমাজেরই মঙ্গল হবে।

—শ্রীকান্ত সরকার, দমদম, কলকাতা।

শিক্ষা নিয়ে বিপ্লব : এক রাজনৈতিক অভিসন্ধি

'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব'—একথা একদা শোনা যেত এ রাজ্যের বামপন্থীদের বিশেষত সিপিএমের মুখে। '৭৭-সালে এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাঁরা শিক্ষা নিয়ে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় হন ব্রতী--- যা নাকি প্রকারান্তরে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'গিনিপিগ এক্সপেরিমেন্ট'-এর সামিল। শিক্ষায় বিপ্লব আনতে তাই তাঁরা প্রাথমিক স্তর থেকে সরকারিভাবে তুলে দেন পাশ-ফেল প্রথা। এর কয়েক বছর পর তুলে দেন প্রাথমিক থেকে ইংরেজি শিক্ষা এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করেন 'শিক্ষায় মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ'। এ কথার দ্বারা সরকার ও শাসকদল বলতে চেয়েছে— ওহে বাচ্চারা, মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ কর! আর এভাবেই সরলমতি ছাত্রছাত্রীরা 'সাম্রাজ্যবাদী' ভাষা ইংরেজিকে 'গুডবাই' জানিয়ে মাতৃভাষার মাতৃদুগ্ধ পান করে নিচু শ্রেণী থেকে পরবর্তী উঁচু শ্রেণীতে 'প্রমোশন' পেতে থাকে। তাদের ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয় ষষ্ঠশ্রেণী থেকে। ফলে, একদা যে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষায় ছিল সারা ভারতে ১ম স্থানে, ৩৪-বছরের বাম রাজত্বে সেই রাজ্য নেমে যায় ২১তম স্থানে। পরে অবশ্য ব্যাপক গণ-আন্দোলনে বিপর্যস্ত সরকার প্রাথমিকে পুনরায় ইংরেজি ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হলেও আর ফিরিয়ে আনেনি পাশ-ফেল প্রথা। ফলস্বরূপ, বহু অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তুলে এনে ভর্তি করিয়ে দেন 'ব্যাঙের ছাতা'-র ন্যায় গজিয়ে ওঠা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে। শত শত প্রাথমিক বিদ্যালয় অতঃপর ছাত্রছাত্রীর অভাবে যায় উঠে। শিক্ষা নিয়ে বিপ্লবের এই হলো নির্মম পরিণতি।

ইদানীং কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী কপিল সিবাল শিক্ষা নিয়ে বিপ্লব করতে গিয়ে নিজ মস্তিষ্কপ্রসূত 'শিক্ষার অধিকার' (রাইট টু এডুকেশন) আইন প্রণয়ন করে চাইছেন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিতে। উদ্দেশ্য, ছাত্রছাত্রীদের ঘাড় থেকে শিক্ষার ভার লাঘব করা। এ রাজ্যের প্রাথমিক স্তর থেকে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া বিপ্লবের পরিণতি যে কত সর্বনাশা হয়েছিল তা তো আমরা দেখেছি। আর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সেই প্রথা উঠে গেলে তার পরিণতি যে আরও ভয়াবহ হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে কয়েকটি অনিবার্য ক্ষতিকারক দিক প্রণিধানযোগ্য। যথা :

(১) পড়াশুনার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ হ্রাস পাবে।

(২) জ্ঞানার্জনের আগ্রহ কমবে।

(৩) ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ ঘটবে না।

(৪) বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার কমবে।

(৫) ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে উঠবে না।

(৬) শ্রেণীর উপযুক্ত ছাত্রছাত্রী সৃষ্টি হবে না।

(৭) বহু ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

(৮) শিক্ষা হারাবে তার গুরুত্ব।

(৯) শিক্ষা পরিণত হবে পণ্যে।

(১০) বহু বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীর অভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

রহস্যময় বিজেপি

বহু বছর ধরে দফায় দফায় প্রাক্তন বিচারপতিদের নিয়োগ করে নেতাজীর মৃত্যু রহস্যের যদি তদন্ত চলতে পারে এবং তাতে কোনও আইনি বাধা সৃষ্টি না হয়ে থাকে এবং সেই তদন্তের প্রক্রিয়া এখনও চলছে। তদন্তের সমাপ্তি ঘোষণা কবে হবে তা বলা সম্ভবত ভগবানেরও অসাধ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে প্রশ্ন, তাঁরা কেন্দ্রে বেশ কয়েক বছর ক্ষমতায় থেকেও কেন দলের প্রতিষ্ঠাতা (শুরুতে ভারতীয় জনসঙ্ঘ, বর্তমানে বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টি) ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনের জন্য কোনও তদন্ত কমিশন গঠন করলেন না? যদি কোনও অসুবিধা থেকেও থাকত তাহলে কেন দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেননি? দেশের কোটি কোটি রাষ্ট্রভক্ত মানুষ মনে করেন বা বিশ্বাস করেন শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু পরিকল্পিত হত্যা। সেই সময় নেহরুই একমাত্র মনে করতেন তাঁর পথের কাঁটা শ্যামাপ্রসাদ। পদে পদে শ্যামাপ্রসাদ নেহরুকে তাঁর ভুল পদক্ষেপের জন্য সাবধান ও সমালোচিত করতেন। আইনি বিধানের জন্য সর্বসমক্ষে কোনও মৃত্যু ঘটলেও তার ময়না তদন্ত হয়ে থাকে অথচ শ্যামাপ্রসাদ এবং দেশের দ্বিতীয় প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কোনও ময়না তদন্ত হয়নি। দেশবরেণ্য দু'জন অত বড় মাপের নেতার হত্যার কেন যথাযথ তদন্ত হলো না সেই প্রশ্ন মনে নিয়ে কোটি কোটি রাষ্ট্রভক্তের অপেক্ষা— কবে তারা এর উত্তর পাবে? কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে অথবা বিজেপি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের তরফ্ থেকে এর উত্তর চাই।

—অমরকৃষ্ণ ভদ্র, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

ধর্ম নিয়ে কেরিয়ার

দেবাশিস আইয়ার

আজকাল সমাজে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় কেরিয়ার গড়ার সময় ধর্ম-সমাজসেবার দিকে মাথা না দেওয়াই ভালো। আগে তো নিজেরটা গুছিয়ে নাও, পরে দেশের কথা ভাববে। খুব ভাল মনে আছে কলেজ জীবনে আমি একটু ধর্ম ধর্ম করতাম বলে আমার এক কলেজ বন্ধু ঠাট্টা করে বলেছিল, তুই অতো ধর্ম-পূজা-ভগবানকে ডেকেও ক্লাস-এ প্রথম দশে নেই, আর আমি ওদের অশ্রদ্ধা করেও দিব্যি প্রথম তিনে থাকছি। কৈ তোর ভগবানের জোর?

যারা ধর্ম নিয়ে বাঁচতে চায়, তাদের প্রতিপদে এরকম হাজার কূটতর্ক ও বিরোধের মোকাবিলা করতে হয়, যেখান থেকে অনেক সময়ই সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। আর এই সন্দেহ ভবিষ্যতে নাস্তিকতার রূপ নেয়। এই রকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একভাবে টিকে থাকতে হবে তা জানার জন্য দরকার সৎসঙ্গ। আর যেটা দরকার, তা হলো ধর্মের সার্থক মূল্যায়ন ও জ্ঞান। 'ধর্ম'-কে যারা শুধু মূর্তিতে ফুল-বেলপাতা চড়ানো বা পুজা- উপবাসে আটকে রাখে তাদের যদি বিশ্বাসের ভিত কোনও কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে নাস্তিকতা চট্ করে ঘাড়ে চাপে। তাই 'ধর্ম' নিয়েও সার্থক পড়াশুনা, অনুশীলন ও চর্চা দরকার। আমার বরাবরই ধর্মতত্ত্বর দিকে ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে ধর্ম বনাম বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব ও আপোষ নিয়ে পড়াশুনা ও চর্চা করতাম। কিন্তু কেরিয়ার গঠনের সময় অর্থনীতি, রাজনীতি ও ম্যানেজমেন্টের ঘেরাটোপে পড়ে সেই চর্চা যথেষ্টই বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন ধর্মতত্ত্ব নিয়ে যে কেরিয়ারও গড়া যায় সে সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণাই ছিল না। পরে যখন কেরিয়ার কাউন্সেলিং শুরু করি তখন জানতে পারি ধর্মতত্ত্ব, ভারততত্ত্ব, ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র নিয়েও অনেক কেরিয়ার অপশন আছে। আজ সেই সমস্ত দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব যাতে এখনকার সময়ে যারা ধর্ম নিয়ে ঝোঁক দেখায় তারা যেন পথভ্রষ্ট না হয়ে ধর্মতত্ত্ব নিয়েই জীবনের চলার পথ মসৃণ করতে পারে।

ধর্ম ও ভারততত্ত্ব (ইন্ডোলজি) নিয়ে যারা আগ্রহী তাদের জন্য উপযুক্ত কেরিয়ার দিশা—

(১) ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন (Philosophy & Religion)

এই বিষয় নিয়ে স্নাতক স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশুনা করার বহু ব্যবস্থা আছে। একটা কথা মনে রাখতে হবে স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহাপুরুষ কিন্তু দর্শনের ছাত্র ছিলেন। বর্তমান সময়ে দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরাই পড়তে যায় যাদের অন্য Stream-এ জায়গা হয় না। এটা ভুল। মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়ে পড়তে এলে দারুণ সুযোগ আছে। রামকৃষ্ণ মিশন, ইসকন, পাতঞ্জলি, শ্রী রবিশঙ্করজীর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পড়া এবং পড়ানোর ভালো সুযোগ আছে। দেশের বাইরে বিশেষ করে ইংল্যান্ড, জার্মানি, জাপান, আমেরিকাতে Philosophy ও Religion নিয়ে গবেষণা করার পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি হয়েছে।

(২) সংস্কৃত ও ভারততত্ত্ব (Sanskrit & Indology)

ভারতীয় দর্শন, ভাষা, শাস্ত্র আর সংস্কৃত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, আমাদের বাংলায় এই নিয়ে চর্চার অবকাশ কম কিন্তু ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ও দেশের বাইরে এই নিয়ে বিস্তর চর্চা ও গবেষণা চলছে। জার্মানী ও আমেরিকা তো বেদবিজ্ঞান ও সংস্কৃত নিয়ে খুব উচ্চমানের গবেষণা করছে। সংস্কৃত নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ বাংলাতেও আছে।

সম্প্রতি বেলুড় বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ইন্ডোলজি নিয়েও উচ্চস্তরের পড়াশুনার জন্য কোর্স চালু করেছে। এই নিয়ে 'এম এ' করার পর স্কুলসার্ভিস, কলেজ সার্ভিসের পাশাপাশি বিদেশে গবেষণা করারও পর্যাপ্ত সুযোগ বর্তমান।

(৩) জ্যোতিষ ও পূজাবিজ্ঞান (Astrology & Puja Science)

যে কোনও বিষয় নিয়েই স্নাতক অবধি পড়ার পর এই বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করা যেতে পারে। বেনারসের সম্পূর্ণানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের পরিচালনায় কলকাতা তথা বাংলার বিভিন্ন জায়গায় এই বিষয়ে ডিপ্লোমা, স্নাতক এমনকী স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে। এই নিয়ে পড়াশুনা করে অধ্যাপনার পাশাপাশি বিভিন্ন মঠ, মন্দিরে ও জ্ঞান প্রশিক্ষিত পুরোহিত হিসাবে চাকরি পাবার সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল।

(৪) সাহিত্য ও ইতিহাস (Indian Literature & History)

সংস্কৃত, পালি, তথা অন্য ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করা যেতে পারে। এছাড়া ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস নিয়েও রিসার্চ করা যেতে পারে। যে কোনও শাখায় স্নাতক হয়ে এই নিয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশুনা করা যেতে পারে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও শাস্ত্র এতই সমৃদ্ধ যে এর এক একটা শাখা নিয়েই বছরের পর বছর গবেষণা করা যেতে পারে। আমি এখানে কয়েকটা উদাহরণ দিলাম। পাঠক এই রকম interdisciplinary অন্যান্য পছন্দসই বিষয় নিয়ে গবেষণা করার কথা ভাবতে পারেন। ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ে প্রস্তাব (proposal) জমা দিলে ওরা গুরুত্ব দিয়েই বিচার করবে।

কিছু বিষয় :

(১) ইংরেজি সাহিত্যে সংস্কৃতের অবদান।
(২) কম্পিউটার প্রোগ্রাম ও সংস্কৃত।
(৩) চাণক্য নীতি ও বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা।
(৪) বিজ্ঞানে ধর্মের প্রভাব।
(৫) তুলনামূলক ধর্ম সাহিত্য।
(৬) মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম।
(৭) নাস্তিক সমাজ বনাম আধ্যাত্মিক সমাজ।

প্রথাগত পড়াশুনা ছাড়াও কেউ যদি শখের পড়াশুনা করতে চায় তাহলে তাদেরও ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় টোলে সংস্কৃতে-জ্যোতিষ্ক পুরোহিত চর্চার ওপর আদ্য-মধ্য-উপাধি ডিগ্রি নিয়েও বিভিন্ন সরকারি জায়গায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে। উপাধি ডিগ্রিধারীরা তো সরাসরি রবীন্দ্রভারতী বা যাদবপুরে সংস্কৃতে বি এ পড়ারও যোগ্য।

দেশের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করলো জাতীয় মহাফেজখানা

এবার জাতীয় মহাফেজখানা (National Archives) ভারতের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করল। পণ্ডিতদের মতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে কোনও একসময়ে এটা লেখা হয়েছে, উপলব্ধ পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটির প্রাচীনত্ব নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মূল কপিটি অবিকৃত রেখে তার নমুনা প্রকাশ করেছে মহাফেজখানা। পাণ্ডুলিপিটি ভূর্জপত্রে ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা হয়েছিল।

১৯৩১ সালে কাশ্মীরের গিলগিট এলাকায় একটি গুহার ভিতরের বৌদ্ধস্তূপ থেকে কিশোর গো-পালকরা তা উদ্ধার করেছিল,

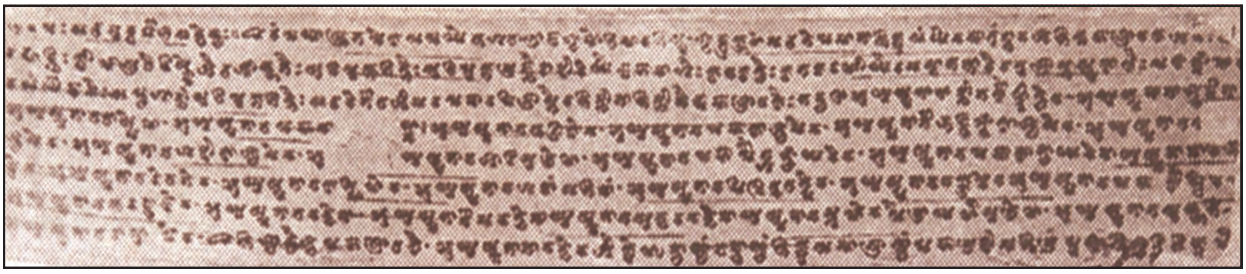

সাধারণ কাগজে লেখা নয় বলে ওটি সংরক্ষণে কোনও অসুবিধা হয়নি। আর শীতল আবহাওয়ার ফলে তা প্রাকৃতিক ভাবেই সুসংরক্ষিত থেকেছে।

জাপানের ইনস্টিটিউট অফ্ ওরিয়েন্টাল ফিলজফি এবং সোকা গোকাই ইনস্টিটিউট-এর সাহায্যে ২৫০ কপি ছেপে তা আগ্রহী পণ্ডিতদের কাছে বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। মূল পাণ্ডুলিপিটি জাতীয় মহাফেজখানার গডরেজ ভল্টে সুরক্ষিত, এমনকী বিশেষ অনুমতি ছাড়া তা বাইরে আনা যাবে না। বৌদ্ধ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক লোকেশ চন্দ্র এই সম্পূর্ণ কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি পাণ্ডুলিপিটিকে ভারতের বিশেষ গর্বের বলে উল্লেখ করেছেন। উৎকীর্ণ বিষবস্তু হলো ‘কমলসূত্র’ (Lotus Sutra)। এর মধ্যে এশিয়ার সংস্কৃত, চীনা, কোরিয়ান এবং জাপানী ভাষার প্রভাব রয়েছে। এই গ্রন্থের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে গান্ধীজীর ভজনাবলী। গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে পণ্ডিত গবেষকদের অনেক সুবিধা হবে।

বৌদ্ধ মতাবলম্বী জাপানী সংস্থাগুলো ওই পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের অনেক ব্যয়ভার বহন করেছেন। তাদের মতে এটি শুধুমাত্র পাণ্ডুলিপি নয় এর আধ্যাত্মিক গুরুত্বও অপরিসীম। সাকা গোকাই প্রতিষ্ঠানের ডঃ দাইসাকু ইকেদার কথায় এটা প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শনমাত্র নয়, সুখ-শান্তি ও নতুন আশা-র দর্শন নিহিত রয়েছে ওই পাণ্ডুলিপিতে।

জাতীয় মহাফেজখানার সহ-নির্দেশক জয়া রবীন্দ্রনের মতে— ‘আমরা নবীকরণ করে সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি। আর কাগজের বদলে ভূর্জপত্রে লেখা থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সুরক্ষিত রয়েছে’।

চকচকে কাগজে কমল সূত্রের মুদ্রণ হয়েছে যা তিন দফায় আবিষ্কৃত হয়েছিল।

গিলগিটের উজির (ওয়াজির) কাশ্মীরের মহারাজাকে প্রথমে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের খবর দেন। মহারাজা জনৈক স্যার অরেল স্টেইনকে দিয়ে তা পরীক্ষা করান। তিনি প্রথমে খৃস্টীয় পঞ্চম শতকেরও পূর্ববর্তী বলে চিহ্নিত করেন। পাণ্ডুলিপির একটি অংশ রাজ্য পুস্তকালয়ে রাখা আছে।

বিষয়বস্তু এবং সাহিত্যিক উৎকর্ষের কথা ছেড়ে দিলেও এটিকে ভারত ইতিহাসের কারুকার্যময় পুস্তকের এক অমূল্য উদাহরণও বলা যেতে পারে। মহাফেজখানার এক পণ্ডিতের মতে পাণ্ডুলিপিটি উত্তরের টানা হাতের লেখায় প্রথাগতভাবে লেখা, গুপ্তযুগ পরবর্তী লিপি ব্যবহার করা হয়েছে। জাতীয় মহাফেজখানার মহানির্দেশক অধ্যাপক মুশিরুল হাসান বলেছেন, যৌথ সহযোগিতা হলে ডকুমেন্ট (তথ্য) সংরক্ষণ করতে সুবিধা হয়। ফলে পরিধিও বাড়ে। ইরানিয়ান কালচারাল সেন্টার পারসিক ভাষার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণে সাহায্য করছে। সহায়তা করছে পুনর্মুদ্রণেও।

ইনায়ত যুগের সংগ্রহেও ইরানীরা সাহায্য করছে। মোগল আমলে সংরক্ষণ প্রায় হয়নি বললেই হয়। প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার নথি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেগুলো কম্প্যুটারাইজ করে ইন্টারনেটে পাওয়ার বা দেখার সুবিধা করার ব্যবস্থা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

নোট বুকের রাইটার চাই

নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ডিগ্রিকোর্স (কল্যাণী, গৌড়, বর্ধমান) ও চাকুরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাজেশন ভিত্তিক বই লেখার জন্য রাইটার চাই। যোগ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। নাম ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে শীঘ্র এস. এম. এস. করুন।

৯৮৩২০৪৩৫১৫, ৯৭৩৫৯৪৮৭৯০

পৌরাণিক নগর

মিথিলা

গোপাল চক্রবর্তী

মিথিলার সমস্ত রাজার বংশকে 'জনকবংশ' বলা হোত—''বংশ জনকানাং মহাত্মানাম্।'' পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তাঁদের 'মহৎপ্রাণ জনক বংশীয়' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। জনক নামের অনেক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত যে মহান জনক আরুণি ও যাজ্ঞবল্ক্যের সমসাময়িক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে এঁদের মধ্যে কোনও জনককে সনাক্ত করা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু একটা ঘটনা তাঁকে পৌরাণিক তালিকার সীরধ্বজ অর্থাৎ সীতাদেবীর পিতার সঙ্গে সনাক্তকরণে সাহায্যে করে। রামায়ণের নায়িকার পিতা জনক ছিলেন কেকয়দের রাজা ও ভরতের মাতামহ অশ্বপতির সমসাময়িক। বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত জনকও ছিলেন কেকয়দের যুবরাজ অশ্বপতির সমকালীন। উদ্দালক, আরুণি ও বুড়িল আশ্বতরাশ্বি উভয় রাজদরবারেই যাতায়াত করতেন। ভবভূতিও এই সনাক্তকরণ মেনে নিয়েছেন। মহাবীর চরিত্রে কবি সীতাদেবীর পিতার প্রসঙ্গে বলেছেন—

''তেষামিদানীং দায়দো
বৃদ্ধঃ সীরধ্বজো নৃপঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যো মুনির্যস্মৈ
ব্রহ্মাপারায়ণং জগৌ।।''

রামায়ণ অনুসারে নিমি নামে এক রাজা মিথিলার রাজবংশের পত্তন করেন। তাঁর পুত্র ছিলেন মিথি এবং পৌত্র ছিলেন প্রথম জনক। মহাকাব্য দ্বিতীয় জনক (সীতার পালক পিতা) এবং তাঁর ভাই সঙ্কাশ্যের রাজা কুশধ্বজ পর্যন্ত এই বংশের কুলজি দিয়েছেন। বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণ নিমি বা নেমিকে ইক্ষ্বাকু হিসাবে উল্লেখ করে তাঁকে বিদেহ আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর পুত্র ছিলেন মিথি। দুই পুরাণ অনুসারে ইনি হচ্ছেন প্রথম জনক। এই দুই পুরাণে সীরধ্বজ পর্যন্ত এই বংশের এক তালিকা পাওয়া যায়। সীরধ্বজকে সীতার পিতা বলা হয়েছে। সুতরাং তিনিও রামায়ণের দ্বিতীয় জনক এক ও অভিন্ন। এর পর দেখা যায় সীরধ্বজ থেকে শুরু করে এই বংশের শেষ পর্যন্ত পুরাণগুলো এক কুলজি দিয়েছে যার শেষ রাজার নাম কৃতি (Kriti) এবং বংশটিকে বলা হয়েছে 'জনক বংশ'।

"ধৃতেস্তু বহুলোশ্বোভূদ্ বহুলাশ্বসুতঃকৃতিঃ
তস্মিন্ সন্তিষ্ঠতে বংশো জনকানাং মহাত্মানাম্।''

বৈদিক সাহিত্যে এক বিদেহ রাজা নমী সাপ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু কোনওখানেই তাঁকে মিথিলার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়নি। অপরদিকে শতপথ ব্রাহ্মণের এক আখ্যান অনুসারে বিদেহ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন বিদেহ মাধব যিনি সরস্বতী নদীর উপত্যকা থেকে এসেছিলেন। তিনি তাঁর পুরোহিত গৌতমকে নিয়ে পূর্বদিকে সদানীরা নদী পর্যন্ত এগিয়ে যান এবং নদী অতিক্রম করে অগ্নির নির্দেশে এখানে বসতি স্থাপন করেন। শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে সদানীরা কোশল ও বিদেহর সীমা নির্ধারণ করত। মহাকাব্য ও পুরাণ তালিকাভুক্ত মিথি বৈদেহ, মাধব বিদেঘর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মাধব বিদেঘ যদি মিথিলার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হন তাহলে নমী সাপ্য এই সম্মানের দাবীদার হতে পারেন না। মজ্জিন নিকায় ও নিমি জাতকে মঘাদের নামে এক ব্যক্তিকে মিথিলা রাজবংশের আদি পুরুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং নিমির জন্ম হয়েছিল ''ঋষি সুলভ রাজ পরিবারের সমাপ্তি ঘটাতে।'' বৌদ্ধ গ্রন্থাদি এই কথাই প্রমাণ করে যে নিমি নামটা প্রথম রাজা গ্রহণ করেননি। পরবর্তীকালের কোনও রাজা বা রাজারা এই নাম ধারণ করেছিলেন।

জাতকের কাহিনিতে মহাজনক দ্বিতীয় বলেছেন— ''মিথিলার প্রাসাদ সমূহ পুড়ে ছারখার হতে পারে। কিন্তু আমার তাতে কিছুই পুড়ে যাবে না।''

এই উক্তি আমাদের দার্শনিক জনকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহাভারত থেকে আমরা জানতে পারি এই উক্তি করেছেন মিথিলার জনক, যিনি 'জনদেব' নামে পরিচিত। জৈন উত্তরাধ্যায়ন অনুসারে এই কথা বলেছেন নমী। এই ঘটনা নিমির সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে বিষ্ণুপুরাণে তাঁকে অরিষ্টের পাশাপাশি দেখানো হয়েছে। এর থেকে এটাই মনে হয় যে নমী বা নেমি এবং মহাজনক দ্বিতীয় অভিন্ন ব্যক্তি। জাতক অনুসারে এই মহাজনক ছিলেন দ্বিতীয় অরিষ্টের পুত্র। যদি মহাজনক দ্বিতীয় এবং নমী একই ব্যক্তি হন তাহলে জনকের সঙ্গে তাঁকে সনাক্ত করা চলে না। কারণ, বৈদিক সাহিত্য, জনক ও নমীকে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ব্যক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে। প্রমাণের অভাবে বৈদিক জনককে জাতকের মহাজনক প্রথমের সঙ্গে এক করেও দেখা যায় না।

শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারতে জনককে সম্রাট আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে তিনি 'রাজন্' অপেক্ষা বড় ছিলেন। যদিও বৈদিক সাহিত্যে 'সম্রাজ' শব্দটি সম্রাটের পরিভাষা হিসাবে কখনও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়নি। শতপথ ব্রাহ্মণে একজন 'সম্রাজ'কে 'রাজন' অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ''রাজসূয় যজ্ঞ করে রাজা হয়, বাজপেয় যজ্ঞ করে হয় 'সম্রাজ'। রাজাদের পদের তুলনায় সম্রাজের পদ উচ্চ।'' আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রে জনককে বৃহৎ যজ্ঞের হোতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংস্কৃতি ও দর্শনের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে জনকের খ্যাতি, রাজা বা যজ্ঞকারী হিসাবে তাঁর পরিচয়কে ম্লান করে দিয়েছে। কোশল, কুরু, পাঞ্চাল, মদ্র প্রভৃতি দেশ থেকে ব্রাহ্মণেরা তাঁর দরবারে ভিড় করতেন। অশ্বল, জারৎকারু, আর্তভাগ ভজ্যুলাহ্যায়নি, উষপ্ত চাক্রায়ণ, কহড় কৌষীতকেয়, গার্গী বাচকনবী, উদ্দালক আরুণি এবং বিদগ্ধ শাকল্য প্রভৃতির মতো ব্রাহ্মণেরা তাঁর দরবারে জমায়েত হতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় খণ্ড থেকে জানা যায় যে জনকের সভায় বহু তর্ক বিতর্কের প্রতিযোগিতা

হোত। এই সব বিতর্কের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন উদ্দালক আরুণির শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয়।

মহাভারতের শান্তিপর্ব অনুসারে জানা যায় যে রাজর্ষি জনক নিষ্ক্রিয়ভাবেই রাজ্যশাসন করতেন। সাংখ্যাচার্য পঞ্চশিখ রাজর্ষির শাস্ত্রগুরু ছিলেন। কথিত আছে গুরুর প্রসাদেই রাজর্ষির ছিন্নসংশয় হন। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের নির্দেশে পুত্র শুকদেব মিথিলায় গিয়ে রাজর্ষির কাছ থেকে মোক্ষশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ মহামনীষীও ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার নিমিত্ত রাজর্ষি জনকের সভায় প্রায়ই সমবেত হতেন। রাজর্ষির অনন্যসাধারণ দানশীলতারাও বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লেখ আছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে ব্রহ্মচারিণী সুলভার সঙ্গে রাজর্ষি জনকের মোক্ষতত্ত্ব আলোচনার প্রসঙ্গটি অত্যন্ত মূল্যবান। ক্ষমতাবান রাজা হয়েও ঋষিসুলভ জীবন চরিত ও জীবন যাপনের জন্য যিনি সেই যুগে 'রাজর্ষি' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি যে ব্রহ্ম ঋষিজ্ঞানী ছিলেন তা নয়, রামায়ণ অনুসারে তিনি একজন কর্তব্যপরায়ণ, স্নেহশীল এবং সফল পিতাও ছিলেন।

জনকের সম্পর্কে Oldenberg বলেছেন— ''পূর্ব দেশের রাজা যাঁর পশ্চিমের সংস্কৃতির প্রতি ঝোঁক ছিল, তিনি পশ্চিম দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তাঁর দরবারে সমবেত করতেন, যেমন মেসিডনের রাজারা এথেন্সের প্রতিভাধরদের সমবেত করতেন তাঁদের দরবারে।''

প্রাচীন সূত্রানুসারে মিথিলা নগরী ৩০০ যোজন বিস্তৃত ছিল। এখানে ১৫,০০০ গ্রাম ও ১৬০০০ ভাণ্ডাগার ছিল। বৃজি সংঘে এক সময়ে লিচ্ছবি ও মিথিলা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিল।

এর বহুপরে কর্ণাটক রাজবংশ মিথিলায় একাদিক্রমে খৃস্টীয় ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে মিথিলার শেষ রাজা হরিসিং মুসলমান আক্রমণের পূর্বেই নেপাল অধিকার করেন এবং নেপালের এক পার্বত্য দুর্গ থেকে মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু ১৩২৫ খৃস্টাব্দে ত্রিহুত সুলতান গিয়াসুদ্দিনের অধিকারে আসে। হরি সিং ও তাঁর বংশধরেরা নেপালে রাজত্ব করেন। ১৩৫৩ খৃস্টাব্দে ত্রিহুতে পুনরায় হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্রাহ্মণ রাজবংশের নাম সুগৌণ। সমসাময়িক পদকর্তা বিদ্যাপতি এই বংশের অনেক প্রশস্তি রচনা করেছেন; আবার ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এতে অনেক অসংগতি লক্ষ্য করেছেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা শিবসিংহ। তিনি ত্রিহুতের সার্বভৌম রাজা ছিলেন এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন। এই বংশ ১৩৫৩—১৫২৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করার পর বঙ্গের সুলতান নসরত শাহের হস্তে পরাজিত হন। এর পরে মিথিলার আর স্বতন্ত্র ইতিহাস পাওয়া যায় না। মিথিলার সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দীর্ঘকালের। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে মৈথিলী ও বাংলা কাছাকাছি ভাষা। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতিকে বাঙালী নিজেদের কবি বলে বরণ করে নিয়েছে বহুকাল আগে। কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ মৈথিলী ভাষায় রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত গীতিকবিতা 'ভানুসিংহের পদাবলী'।

লৌকিক দেবতা

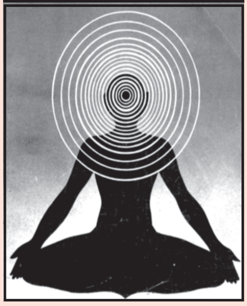

গেঁড়িবুড়ি

নবকুমার ভট্টাচার্য

পশ্চিম-মেদিনীপুর জেলার দাশপুর থানার বলিহারপুর গ্রামের দেবী গেঁড়িবুড়ি। দেবী একরত্ন বিশিষ্ট একটি মন্দির রয়েছে। মন্দিরের লিপি লেখা রয়েছে--- ''শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৭৯ সন ১১৬৪ সাল।'' লিপিফলকের নিচে রাধাকৃষ্ণের একটি ছোট টেরাকোটা ছাড়া মন্দিরের গায়ে অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য শিল্পকৃত্য নেই। গেঁড়িবুড়ি নমশূদ্র গোষ্ঠী ও অন্য কিছু নিম্নবর্ণের মানুষের দেবতা। ১১৬৪ সালে ইংরেজ ও নবাব সিরাজদ্দৌলার মধ্যে যে আলিনগরের সন্ধি হয় তার অব্যবহিত পরে এক দস্যু নাকি এ মন্দির তৈরি করে দেন। তবে গেঁড়ি বুড়ির উৎপত্তি ইতিহাস সম্বন্ধে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। মন্দিরে বস্ত্রালঙ্কার পরিহিতা গেঁড়িবুড়ি দেবীর ভয়ঙ্করী মূর্তির পাশে কয়েকটি সিংহাসনে কূর্ম, বুদ্ধ ও গোলাকৃতি ১৮টি শিলাবিশিষ্ট ধর্মরাজের অধিষ্ঠান। এঁরা হলেন— রঘু রায়, কালু রায়, মোহন রায়, সুন্দর রায়, দামোদর রায়, মদন রায়, বুড়ো রায়, কিশোর রায়, দলমাদল, যাত্রাসিদ্ধি। মনোহর রায়, বুদ্ধ, রথচক্র, শ্যাম রায়, স্বরূপনারায়ণ, গৌড়ধ্বজ, জয়বিজয় ও বাঁকুড়া রায়। নমশূদ্র জাতিগোষ্ঠীর পণ্ডিত উপাধিবিশিষ্ট পূজকেরা বারো পুরুষ ধরে এই দেবীর পুজো করে আসছেন। দুর্গাপুজোর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে শাক্তমতে দেবীর পুজো এবং ছাগ ও মেষ বলি হয়। পুজোর আচার, নিয়মকানুন এবং মন্ত্র পাঠ অনুসারে গেঁড়িবুড়ি আসলে দেবী চণ্ডীরই একরূপ। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে এখানে দু'দিনের মেলা বসে।

একসময় বর্ধমান রাজার ১০৬৭০নং তায়দাদ (১২০৯ সাল) অনুসারে ১২০ বিঘা ১৩ কাঠা জমির উপার্জন দ্বারা দেবীর পুজোর ব্যয় নির্বাহ হোত। তখন পুজো এবং নিত্যভোগ হোত। বর্তমানে ভূমিগ্রহণ নীতির ফলে তা লুপ্ত হয়েছে। এখন পুজো হয় ফুল বেলপাতা বাতাসা ইত্যাদি দিয়ে। গেঁড়িবুড়ির প্রভাব গোটা জেলা জুড়ে। মানুষ হাঁপানি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য দেবীর কাছে মানত করে। পূজারীরা বংশ পরম্পরাক্রমে ছুলি, ধবল, হাঁপানি, স্ত্রীরোগের জন্য ওষুধ দেন। গেঁড়িবুড়ির পুরাতন বস্ত্রের অংশের চাহিদাও কম নয়। মানত শোধ করা হয় পাঁঠা, নতুন ঝাঁটা, নতুন হাঁড়িসরা, পদ্মফুল, গামছা, কাপড় দিয়ে।

বর্তমানে গেঁড়িবুড়ি উচ্চ নীচ সব সম্প্রদায়ের মানুষের দেবী। মন্দিরের নিকটে ষষ্ঠীতলা। অনেকের মতে বহু পূর্বে নাকি ওটিই দেবীর থান ছিল।

নবাঙ্কুর

নতুন করে বলা

গরমের দুপুরে তিন প্রাণীর খিদে তেষ্টা মেটাল একটা ফল

গরম তো নয়, একেবারে ছাতিফাটা গরম। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় নরেন দাস। রোজ ঘরে ফেরা তার হয় না। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গে জীবজন্তু একটা দুটো থাকে। সে পাতার বাঁশি তৈরি করে। আর মাটির খেলনা। ছোটোদের জন্যেই সেসব তৈরি করে। যারা পয়সা দিতে পারে না তাদের এমনিই দিয়ে দেয়। ছোটোদের মুখে হাসি দেখলে তার মন ভরে যায়। খেলনার জিনিস দরাদরি পছন্দ নয় তার। যাদের চেহারা পোশাক হাবভাব দেখে মনে হয় পয়সাকড়ি আছে, তারা দাম কমাতে চাইলে এক পয়সা কমায় না। গরীব ছেলেমেয়েদের বলে, 'নিয়ে যাও। দাম দিতে হবে না।'

সেদিন সকাল থেকে হাটে বসেছিল। বিক্রি তেমন হয়নি। বাড়ি ফেরার পথ ধরল। খিদে তেষ্টা গরমের দিনে বাড়ে। শুধু নিজের তো নয়। সঙ্গে আছে ছাগল মতুয়া। আর মুরগী পুটু। তিনজনে কি খাওয়া যায়? কুড়ি টাকা বাড়ি নিয়ে যাবে ঠিক করল। দশ টাকা খরচ করে তিনজনে কি খাওয়া যায়?

'হ্যাঁ, ঠিক করে ফেলেছি' নিজেকেই বলল খুশিতে নরেন। মতুয়া আর পুটুকে বলল, 'তোরা এখানে থাক। ঝোলাঝুলি রইল। আমি এক্ষুনি আসছি।' একটুবাদে ফিরল একটা বড়সড় তরমুজ নিয়ে। রামনাথ ফলওয়ালার দোকান থেকে বেছে কিনেছে দশ টাকায়। ধুয়ে আনল ভালো করে পুকুরের জলে। তারপর চান করল! একটা বটগাছের তলায় ছায়াতে তিন প্রাণী বিশ্রাম নেবে ঠিক করল। তরমুজ দেখে খুশি মতুয়া আর পুটু। নরেন বলল, 'একটু সবুর কর দিচ্ছি!'

তরমুজ কাটল ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে। কালো কালো বীজগুলো আলাদা করে রাখল। খোসা রাখল আরেক জায়গায়। শাঁস রাখল আরেকটা পাতায়। মতুয়া খোসা খেতে শুরু করল। বীজ খেতে লাগল খুশি মনে পুটু। ওদের খাওয়া দেখার পর বলল, 'এবার আমি খাই?' ওরা ঘাড় তুলে জানাল, 'নিশ্চয়ই।' খাওয়ার পর বিশ্রাম। রোদের তাপ কমতে ওরা বাড়ির পথ ধরল।

কৌশিক গুহ

অন্য বার্তা

চিলিতে টাই পরা বন্ধ হলো বিদ্যুৎ বাঁচাতে

গরমের দেশে টাই পরা চালু করেছিল ঠাণ্ডা দেশের লোকরা। আমাদের দেশে কেতাদুরস্ত সাহেবি চালে অভ্যস্ত লোকজন গলায় টাই বাঁধতেন। তাতে কাজের দক্ষতা না বাড়ুক গর্ব ও দর্প বাড়ত। নামকরা ইংরেজি স্কুলের দেখাদেখি অনেক সাধারণ স্কুলেও টাই যোগ হলো ইউনিফর্মে। বিভিন্ন পণ্যের ফেরিওয়ালারাও পরে টাই। গরমে হাসফাঁস করলেও গলায় বন্ধনী না থাকলে স্মার্ট হওয়া সম্ভব নয়— এমন ধারণা বাড়তে থাকল। চিলির সরকার জানিয়েছে কয়েকমাস আগে, পুরুষদের টাই পরা চলবে না। কেন এমন নির্দেশ? উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ বাঁচানো। গলায় বাঁধা থাকবে টাই, তার সঙ্গে বৈদ্যুতিক শক্তির কী সম্পর্ক! কারণ আছে বইকি। সেদেশে দুপুরে গরম বেশ বাড়ে। তাপের দাপট থেকে রক্ষা পাবার জন্যে চলে পাখা, এয়ারকন্ডিশন যন্ত্রপাতির। বিদ্যুৎশক্তির সাহায্য ছাড়া স্বস্তি মিলবে না। দুপুরে পুরুষরা টাই পরে কেতাদুরস্ত থাকে। তাতে গরম লাগে বেশি। টাই পরা বন্ধ করে জামার ওপরের বোতাম খোলা রাখলে গরম কমে যাবে। তাতে বিদ্যুৎ বাঁচবে অনেকটা। সরকারের নির্দেশ, টাই বর্জন করতে হবে সকলকে। কেউ বাদ যাবে না।

বার্তাবহ

গরমের ছুটিতে গ্রামে

রিয়াদের গ্রাম-সমীক্ষা

গরমের ছুটিতে ঠিক হলো দল বেঁধে যাওয়া হবে বর্ধমানের এক গ্রামে। সেখানে রিয়ারা অনেকবার গেছে। বেশ খোলামেলা জায়গা। একদিকে মাঠ। অন্যদিকে কিছু বাড়ি। গাছ প্রচুর। নানারকম গাছ। মানা পিসি অনেক গাছ চিনিয়েছিল। পাখিও। সব মনে রাখতে পারেনি। ওখানে মুকুল-জেঠুদের বাড়ি। মুকুল-জেঠু রিয়ার পিসেমশাইয়ের বন্ধু। কতবার না জানিয়ে চলে গেছে দল বেঁধে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে খুশির বান ডাকত। একসঙ্গে বেড়ানো খাওয়া ঘুম। মুকুল জেঠুর মা বলত, 'দিদিভাই, আবার করে আসবে?' রিয়া বলত, 'তুমি মনে মনে ডাকলেই চলে আসব।' বাগানের কত ফল, আচার দিত। হইহই করে ক'দিন কাটিয়ে ফেরা হোত কলকাতায়।

এবার গরমের ছুটিতে মুকুল-জেঠুর বাড়িতে গ্রীষ্মকালীন শিবির হবে ঠিক করেছিল পল্লব। গ্রাম দেখা চেনা ভালোভাবে দরকার। ব্যাগে আঁকা লেখার জিনিসপত্র ছাড়া ছিল ক্যামেরা। টেপরেকর্ডার। ঠিক হলো ছোটোরা সকালে গ্রাম দেখতে বেরোবে। সঙ্গে বড়োরা দুতিনজন থাকবে। ওরা সাইকেল চালাতে পারে প্রত্যেকে। নানারকম তথ্যে ওদের খাতা ভরে উঠল। কত জিনিস সংগ্রহ করল। গ্রামের ম্যাপ তৈরি করল। কতজনের সঙ্গে কথা বলল। ধরে রাখল টেপরেকর্ডারে। ছেলেমেয়ের দল ব্যস্ত খুব। মুকুল-জেঠুর বাড়িতে খাতির-যত্নে ফাঁক নেই।

সাতদিন বাদে ফিরল ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে। মুকুল-জেঠু স্টেশনে ছাড়তে এসেছিল। আগের দিন সন্ধ্যেবেলা রিয়া গেয়েছিল অনেকগুলো গান। মন ভরে গিয়েছিল সকলের। মুকুল-জেঠু বলল, 'আবার এভাবে চলে আসিস দলবেঁধে।'

রিয়া বলল, 'আমরা তোমাদের গ্রাম নিয়ে একটা বই তৈরি করে আবার আসবো।'

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. ভারতের কোন্ বিখ্যাত সংগীত-শিল্পীর নামে এক শিশুর নাম রাখা হয়, যিনি বড়ো হয়ে দেশগৌরব খেলোয়াড় হন?
২. এদেশের প্রথম মহিলা চিত্র সাংবাদিকের নাম? জন্ম ও মৃত্যু?
৩. সেতার বাদ্যযন্ত্রে প্রধান কটা তার থাকে?
৪. তানপুরায় তার কটা? গোলাকার খোলটির জন্যে কি ব্যবহার হয়?
৫. পণ্ডিত ভাতখণ্ডের পুরো নাম?
৬. কোন্ কোন্ জিনিস নিয়ে সংগীত?

উত্তর ১. শচীন দেববর্মণ। শচীন তেণ্ডুলকর। ২. হোমাই ব্যেরাওয়ালা। (৯ ডিসেম্বর ১৯১৩—১৫ জানুয়ারি ২০১২)। ৩. সাতটি। ৪. চারটে। লাউ। ৫. বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে। ৬. নৃত্য। গীত। বাদ্য।

ছোটোদের বলছি

তোমাদের বিভাগ 'নবাঙ্কুর-এ' তোমরা যোগ দাও— এই ডাক আমরা বারবার দিচ্ছি। লেখা পাঠাও, আঁকা পাঠাও।

নিজের নাম, স্কুলের নাম, বয়স লিখতে ভুলবে না।

সম্পাদক, স্বস্তিকা।

উলটো পালটা

স্কুলে কৃষ্ণকুমার কর-এর নামটা সংক্ষেপে দাঁড়িয়েছিল কে-কিউব। তিনি ক্লাসে ঢুকতে সবাই উঠে দাঁড়াল।

কে-কিউব বললেন, 'সবাই বসো। যারা বোকা আর অপদার্থ তারা বাদে।'

সকলে বসল। সুমিত দাঁড়িয়ে রইল।

কে-কিউব বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে কেন? তুমি কি বোকা আর অপদার্থ?'

সুমিত উত্তর দিল, 'না স্যার। আপনি একা দাঁড়িয়ে আছেন দেখে মনে হলো ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।'

।। ২।।

ছেলেবেলায় শেখা একটা উপদেশ মোহন সিং ভোলেনি চল্লিশ পেরিয়েও। 'সামনে তাকিয়ে চলবে।' খুব দামি কথা। সেদিন অফিস যাওয়ার সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ আছাড় খেলো। ভারী বিরাট চেহারা। পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু মনে তার প্রশ্ন, 'হঠাৎ পড়ে গেলো কেন?' ধুলোটুলো ঝেড়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরোল।

পরের দিন অফিসে যাওয়ার সময় দেখল সিঁড়ির এক ধাপে কলার খোসা পড়ে আছে। মোহন থেমে গেলো। পকেট থেকে সেলফোন বের করে বউকে জানাল, 'খুব খারাপ ব্যাপার। আজও আমার বরাতে পড়া আছে।' একথা বলার পর সামনে তাকিয়ে চলল। কলার খোসায় জুতোসুদ্ধ পা পড়ল। তারপরই আছাড়।

রামগরুড় সংকলিত

অনন্যা প্রতিভার অধিকারিনী বিনোদিনী

ইন্দিরা রায়

আজকের হাতিবাগান অঞ্চলকে যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহলে ওই হাতিবাগান অঞ্চল ছিল নাট্যক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দু। রাস্তার নাম ছিল কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট। ছোট্ট রাস্তার ১৫৪নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের খোলার চালের ঘরে বাস করত এক ছোট্ট মেয়ে। অভাবের সংসারে তার সঙ্গী ছিল মা, দিদিমা আর ছোট ভাই। ডাক নাম পুঁটি মেয়েটির। পোশাকী নাম হয় বিনোদিনী দাসী— যখন অবৈতনিক স্কুলে পড়তে যায় তখন। প্রতিটি নবজাতকের জন্মের পর ভবিষ্যত নির্ধারিত হয় ভাগ্যদেবতার নির্দেশে। পুঁটি নামে ছোট্ট মেয়েটির ভবিষ্যত তাকে এক প্রথিতযশা অভিনেত্রীতে পরিণত করেছিল এবং বহুমুখী প্রতিভাময়ী এক বলিষ্ঠ নারীতে রূপান্তর ঘটিয়েছিল। কিন্তু খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেও আজীবন দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জীবনের শেষ অঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। তিনি নিজে কখনও বারাঙ্গনা জীবনের কথা অস্বীকার করেননি, বরং এই জীবন থেকেই নিজেকে তাঁর সারস্বত সমাজের বিকাশ ঘটাবার পথ খুঁজেছেন এবং একজন সম্পূর্ণ নারী হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। তিনি পুঁথিগত বিদ্যালাভের সুযোগ বেশিদিন না পেলেও নিজস্ব প্রতিভার জোরে নিজেকে অভিনয় ক্ষেত্রেই শুধু নয়; কাব্য-সঙ্গীত রচনাতেও ব্যতিক্রমী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। জন্মের পর থেকেই অভাব দারিদ্র্য চরম আঘাত-প্রতিঘাত তাঁকে কষ্টিপাথরে যাচাই করা সোনায় রূপান্তর ঘটিয়েছিল। মাত্র এগারো বছর বয়সে অভিনয় জগতে প্রবেশ। প্রথম অভিনয় পরিচারিকার ছোট্ট চরিত্রে— তা পরবর্তী জীবনে নায়িকাতে পরিণত করে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের অদ্ভুত অভিনয় শিক্ষার ধারায় আপ্লুত হন বিনোদিনী। অভিনয় শিক্ষার ধারায় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের উদ্দীপনায় জন্মগত এক অভিনেত্রী যে হয়ে ওঠা যায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিনোদিনী। গিরিশ ঘোষ বলেছেন— 'আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে রঙ্গালয়ে বিনোদিনীর উৎকর্ষ আমার শিক্ষা অপেক্ষা তাহার নিজ গুণ অধিক। সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করিতে যেমন মণিখণ্ডের প্রয়োজন।' বিনোদিনীর মধ্যে ব্যতিক্রমী কিছু সাংস্কৃতিক মনন তাকে থিয়েটারের আবহে উপলব্ধি করে নিতে সক্ষম করেছিল যে বেঙ্গল থিয়েটারে সাংস্কৃতিক মণ্ডলী সৃষ্টি করা যায়। বিভিন্ন গুণী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে তাঁর চরিত্রাভিনয় হয়ে উঠত বলিষ্ঠ। বিনোদিনী থিয়েটারকে 'মন্দির' বলে মানতেন এবং মন্ত্রপীঠ হিসেবেও গণ্য করতেন। বিনোদিনীর কাব্য প্রতিভার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর জীবনের দুঃসহ বেদনা, ঘাত-প্রতিঘাত, অসম্মান প্রত্যাখ্যানের বর্হিপ্রকাশ তাঁর লেখনীতে। তিনি নিজে লিখছেন--- ''এই ভাগ্যহীনা হতভাগিনীর হৃদয় যে কত দীর্ঘশ্বাসে গঠিত, কত মর্মভেদী যাতনার বোঝা হাসিমুখে চাপা, কত নিরাশা, কত হা-হুতাশ, দিবানিশি আকুলভাবে হৃদয়মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কত আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ত বাসনা, যাতনার জ্বলন্ত জ্বালা লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে— তাহা কি কেহ কখনও দেখিয়াছেন? অবস্থার গতিকে নিরাশ্রয় হইয়া স্থানাভাবে আশ্রয়াভাবে বারাঙ্গনা হয় বটে, কিন্তু তাহারাও প্রথমে রমণী হৃদয় লইয়া সংসারে আসে। যে রমণী স্নেহময় জননী, তাহারাও সেই রমণীর জাতি। যে রমণী জ্বলন্ত অনলে পতিসনে পুড়িয়া মরে, আমরাও সেই একই নারী জাতি।'' সে যুগের সামান্য অক্ষর জ্ঞানসম্পন্না এক অভিনেত্রীর কাব্যরচনা যে এমন প্রাঞ্জল হতে পারে, কাব্য যে এমন সূক্ষ্ম ভাবরসে পরিপূর্ণ হতে পারে তা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ ক'রে তেইশবছর পেরিয়ে যাওয়ার পর বিনোদিনী তাঁর জীবনের কাহিনী নিয়ে স্মৃতিকথা লিখতে শুরু করেন। ১৮৮৫/৮৬-তে তৎকালীন 'ভারতবাসী' পত্রিকায় নাট্যমঞ্চ বিষয়ে কিছু চিঠি লেখেন। ১৯১০-এ 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় প্রথম বিনোদিনীর স্মৃতিকথা প্রকাশ পায়। 'আমার কথা— ১ম খণ্ড' প্রকাশ হবার পনেরো বছর পরে বাষট্টি বছরে বিনোদিনী আবার লেখা শুরু করেন। সে সময়কার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'রূপ ও রঙ্গ'তে ধারাবাহিকভাবে 'আমার অভিনেত্রী জীবন' প্রকাশিত হয়েছিল দু' বছর ধরে। প্রথমদিকে আমার কথার লেখায় ছিল সাধুভাষা। কিন্তু পরিণত বয়সে যখন দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ পায় তখন সে গ্রন্থের ভাষা অনেক সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল। এখানকার লেখার স্টাইল অতি সহজভাবে গল্প বলার মতোই সহজ সরল। কাব্যসাহিত্যের বাতায়ন তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল ধীরে ধীরে। তারই জেরে তিনি দুটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন— 'বাসনা' এবং 'কনক ও নলিনী।' ৪১টি কবিতার সংকলন 'বাসনা' প্রকাশ পায় ১৮৯৬-তে। তিনি সঙ্গীত রচনাতেও সুদক্ষ ছিলেন তার প্রমাণ মিলেছে অমৃতলাল বসু সম্পাদিত বীণার ঝংকার, রেকর্ড সঙ্গীতে তাঁর রচিত গানের সংকলনে। তাঁর প্রথমদিকের লেখার মধ্যে প্রকাশিত অন্তরের ক্ষোভ, সমাজের প্রতি কটাক্ষ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে লেখার মধ্যে ছিল স্বাভাবিকতার প্রকাশ। ১৯০৫-এ প্রকাশিত আরেকটি কাব্যগ্রন্থ 'কনক ও নলিনী' গ্রন্থটি তাঁর একমাত্র কন্যা শকুন্তলার উদ্দেশে। তাঁর কেশ বিন্যাসও ছিল ব্যতিক্রমী। সুনিপুণ হাতে নানাভাবে কেশ-বিন্যাস করার ব্যাপারে এতটাই দক্ষ ছিলেন যে মঞ্চে নিজের এবং অন্যের কেশ ঠিক করে দেওয়ার জন্য তাঁর ডাক পড়ত।

নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও বিনোদিনীর লক্ষ্য ছিল উত্তরণ। তার লক্ষ্য পূরণ হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদধন্যা হয়ে। তাঁর হৃদয়ে ছিল ঈশ্বরানুভূতি। তারই নিষ্ঠা ও ভক্তিভাবে চৈতন্যলীলাতে চৈতন্যরূপী বিনোদিনীকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আশীর্বাদ করেন মাথায় স্পর্শ করে— 'তোমার চৈতন্য হোক।' মনে করা হয় যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ -দেবের আশীর্বাদধন্যা বলেই বোধহয় বিনোদিনী সারস্বত সম্পদে বলিষ্ঠা। তাঁর অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ছিল বলেই শেষ জীবনের দীর্ঘ তেইশ বছর ইষ্টমন্ত্র জপ করে ঈশ্বর চিন্তায়, সাহিত্য সাধনায় কাটিয়েছেন বিনোদিনী। জীবনের শেষ লগ্নে গেরুয়া পোশাক থাকত তাঁর অঙ্গে। একাকী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে নীরবে ১৯৪১-র মাঘী পূর্ণিমার পুণ্য তিথির শেষ লগ্নে। তিনি সমগ্র নারী সমাজের কাছে নমস্যা এক নারী।

ম্যাডাম সোনিয়া গান্ধী আপন অর্থ বিলোচ্ছেন, হাত পাতুন

মাননীয় সোনিয়া গান্ধী
সভানেত্রী, জাতীয় কংগ্রেস
১০ নম্বর জনপথ, নয়াদিল্লী,

ম্যাডাম গান্ধী, প্রথমেই আপনাকে শুভেচ্ছা জানাই। দীর্ঘ বিরতির পর আপনি খবরে ফিরেছেন। দলীয় সাংসদদের নিয়ে সম্প্রতি একটি বৈঠকও করেছেন। সে বৈঠকে আপনি সিংহী বিক্রমে হুমকি দিয়েছেন, দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মোটেও বরদাস্ত করা হবে না। কঠোর থেকে কঠোরতর হাতে তার মোকাবিলা করা হবে। রাগ ঝেড়েছেন দলীয় কর্মীদের ওপর। সব থেকে বেশি গলা ফুলিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের কর্মীদের উদ্দেশে। বলেছেন, কর্মীদের বেয়াদপির জন্যই দলের এমন মুখ পোড়ানো ফল হয়েছে।

আপনার এহেন মন্তব্য শুনে আপনার বশংবদ প্রধানমন্ত্রী মনমোহনবাবু, আপনার ম্যানেজার বাংলার মুখুজ্যে মশাই সকলেই সমস্বরে ঠিক ঠিক ধ্বনি দিয়েছেন। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি তাই? আপনি যখন ইতালিতে একটু একটু করে বড় হচ্ছেন তখনকার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসটা না হয় আপনার জানা নেই। আপনার শ্রদ্ধেয় দাদা শ্বশুর নেহরু চাচা, কিংবা শ্বাশুড়ি মাতা ইন্দিরাজির সময়টাও না হয় আপনি জানেন না, কিন্তু স্বামী রাজীবের সময়কালটা তো জানা উচিত ম্যাডাম। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছাড়া কংগ্রেস হয় নাকি! ওটাই তো আপনাদের দলের ভূষণ, সম্পদ। দলীয় প্রতীক হাত হলেও ডান হাত আর বাম হাতের লড়াই চিরকাল ছিল, আছে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে থাকবেও। দলের মধ্যে দল, উপদলের মধ্যে উপদল এনিয়েই তো গোটা কংগ্রেস।

তবে আপনি যে এগুলো জানেন না সেটা আমি মানতে পারছি না। যেটুকু খবর, ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে বেশ পড়াশোনা করে তবেই রাজীবের প্রেমে পড়েছিলেন আপনি। অনেক দিন আগেই আজকের ভারতটাকে দেখতে পেয়েছিলেন। সব অঙ্ক মিলিয়ে আপনিই দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করেছেন। এখন বাকি যেটুকু সেটা হলো উত্তরাধিকার হিসেবে ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু প্রথম পরীক্ষাতেই উত্তরপ্রদেশে হোঁচট খেয়েছে বেচারা রাহুল। মা, বোনের ওপর ভরসা করেও তাঁর তরণী ভাসেনি উত্তরপ্রদেশের উজানে। তবে তারুণ্যের বুকের পাটা দেখিয়ে সে দায় স্বীকারও করে নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু আপনি আপনার লোক এ কে অ্যান্টনিকে দিয়ে রিপোর্ট তৈরি করিয়েছেন। সেই রিপোর্টে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে সাধারণ কর্মীদের। ছেলেকে আড়াল করতে মায়ের এই উদ্যোগটুকু থাকতেই পারে। তাতে ইতিহাস বদলায় না। আর সে কারণে আপনাকে চিঠিও লিখছি না। কথায় কথায় উঠে এল সে কথা।

কিন্তু সেদিনের বৈঠকে আপনি আরও যে কথাটা বলেছেন সেটা নিয়েই আমার আপত্তি। আপনি সাংসদদের নিয়ে বৈঠকে গর্বভরে দাবি করেছেন ইউপিএ সরকার গত আট বছরে রাজ্যগুলিকে অনেক অনেক অর্থ দান করেছেন। অভূতপূর্ব হারে সহায়তা অর্থ দান করেছেন।

এটা অবশ্য ম্যাডাম আপনি আপনার শ্বশুরকুলের ইতিহাস থেকেই শিখেছেন। জওহরলাল নেহরুই এমন একটা প্রবণতা শুরু করেছিলেন। ভাবটা এমন যেন কেন্দ্রই সব করে। কংগ্রেস বরাবর দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিকেন্দ্রীকরণের সাংবিধানিক নীতিকে পদাঘাত করেছে।

ম্যাডাম, একটু ইতিহাসের কথা বলি। বাবাসাহেব আম্বেদকর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে যে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছেন তাতে অভিভাবকের ভূমিকায় কেন্দ্রীয় সরকারকে রাখা হলেও রাজ্যগুলিকে পাত্তা না দেওয়ার তত্ত্ব ছিল না। কিন্তু নেহরুর আমল থেকে কংগ্রেস সেটাকেই পরম্পরা বানিয়ে রেখেছে। চিরটাকাল কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকলেই রাজ্যগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া মানেই সেটা দয়ার দান এমন ভাব দেখিয়ে এসেছে কংগ্রেস। শুধু অর্থ নয়, ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সেই কর্তার ভূমিকা দেখিয়ে এসেছে কংগ্রেস। কেন্দ্রে যখনই কংগ্রেস ক্ষমতায় থেকেছে তখনই রাজ্যগুলিকে ন্যায্য সহায়তার জন্য হাত পাততে হয়েছে। অকংগ্রেসি সরকার হলে অনেক সময়ই খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। করের অংশীদারিত্ব নিয়ে দর কষাকষি, কেন্দ্র রাজ্য ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস নিয়ে অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে। আপনিও ম্যাডাম, সেই রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন।

আপনার আমলে শুধু বিরোধী দলের সরকার নয়, শরিক তৃণমূল কংগ্রেসকে সরব হতে হয়েছে। দর কষাকষি করতে হচ্ছে। বিরোধীরা তো নয়ই, নিজেদের শরিক দলগুলির সঙ্গেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে আলোচনার সৌজন্য দেখালেন না। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করে তিস্তার জল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভাগ করার, ছিটমহল বিনিময় করারও উদ্যোগও নিয়েছে মনমোহন সিং সরকার। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুখ পুড়েছে। মাঝপথে ফিরে আসতে হয়েছে। থমকে যেতে হয়েছে। পিছু হটতে হয়েছে। তবে একটা ব্যাপারে প্রশংসা করতেই হবে এত করেও আপনাদের লজ্জা নেই।

দিন কয়েক আগে একটি সর্বভারতীয় ইংরাজি কাগজে পড়লাম বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির পাঠানো অন্তত ২০টি বিল রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির সইয়ের অপেক্ষায় বছরের পর বছর পড়ে আছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের জিটিএ বিলও আটকে রেখেছিলেন আপনারা। সেটা না হয় শরিক তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিক চাপ দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে। কিন্তু বিজেপির তো চাপ দেওয়ার উপায় নেই। ম্যাডাম কয়েক বছর আগের এন ডি এ আমলের ইতিহাস পড়ুন। পড়লে দেখবেন অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের সঙ্গে বামফ্রন্টের যে বোঝাপড়া ছিল সেটাও নেই কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের মধ্যে।

যাই হোক, একটা কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিই ম্যাডাম, যুক্তরাষ্ট্রীয়তা একটা আদর্শ। ভারতীয় আদর্শ। টাকা বিলোলেই সেই আদর্শ রক্ষা করা হয় না। আর মনে রাখবেন যে টাকা রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে সেগুলি ইতালিয় নয়, ভারতীয় মুদ্রা। আর তা ১০ নম্বর জনপথের কোষাগার থেকে নয়, দেওয়া হয়েছে দেশের কোষাগার থেকে। আর সেটা প্রতিটি রাজ্যের প্রাপ্য। তবুও শোনা যাচ্ছে, ম্যাডাম নাকি টাকা বিলোচ্ছেন!

—সুন্দর মৌলিক

ভারত-বিরোধী শক্তি আবার সক্রিয় বাংলাদেশে

অতিথি কলম

রাজীব শর্মা

সম্প্রতি বাংলাদেশে মাফিয়া ডন দাউদ্ ইব্রাহিমের ভাইপো দাউদ মার্চেন্ট ওরফে আবদুল রউফ এবং তার সাকরেদ জাহিদ শেখ গ্রেপ্তার হয়েছে। এই গ্রেপ্তারির মাধ্যমে জানা গেছে আই এস আই পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী লস্কর-এ-তৈবা-র সঙ্গে যোগসাজসে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ সরকারকে অস্থির করতে সক্রিয় নয়, সেইসঙ্গে তাদের ষড়যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতও। আওয়ামী লীগ সরকার পাকিস্তানী দৃষ্টিতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত এক শত্রু সরকার এবং তাই এই সরকার তথাকথিত ইসলামিক ন্যাশনালিস্ট ফোর্সের বিচারে একটি ধর্মীয় শত্রু সরকার।

বর্তমানে এইসব শক্তি গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হাসিনা সরকারকে উৎখাত করতে তৎপর এবং সেই লক্ষ্যে এরা মাফিয়া এবং গোঁড়া ইসলামী গোষ্ঠীগুলির সাহায্য চাইছে। গত কয়েক মাসের কিছু ঘটনাবলী এরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। স্পষ্টত এরা চাইছে সারাদেশে আইন- শৃঙ্খলার সমস্যা তৈরী করে গোলযোগ তৈরী করা এবং সেইসঙ্গে ১৯৭১ সালে মানবতার বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যারা জেহাদ ঘোষণা করেছিল তাদের বিচারপর্ব-কে বানচাল করতে প্রতিহিংসার মাধ্যমে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করা। এইসব প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত সেই দেশেরই ভারতবিরোধী তথা কট্টর পাকিস্তান-পন্থী শক্তি বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বি এন পি) এবং জামাত-এ- ইসলামী।

এদের লক্ষ্য হলো ধর্মের মোড়কে রাষ্ট্রশক্তি দখল করা। সম্প্রতি বাংলাদেশের সেনা দাবি করেছে যে, গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকারকে এরকম এক ডজন ধর্মান্ধ সেনা অফিসারদের উৎখাত করার প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে সরকারের অনুগত সেনাবাহিনী। জানুয়ারির ১৯ তারিখে সেনা মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার রেজ্জাক মাসুদ বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে, "আমরা সেনাবাহিনীর একাংশের সরকারকে উৎখাত করার ঘৃণ্য প্রয়াস বানচাল করেছি।" বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে— "সেনা জওয়ানদের সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এই ধর্মান্ধ সেনা অফিসারদের চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত কিছু নির্বাসিত বাংলাদেশী।"

বিস্তারিতভাবে বিবৃতি দিয়ে জেনারেল রেজ্জাক বলেছেন যে, পলাতক এক মেজর ই-মেলের মাধ্যমে চাকরির সঙ্গে যুক্ত এমন সব সেনাকর্তাদের বার্তা পাঠিয়ে জানায়,

খালেদা জিয়া

শেখ হাসিনা

সেদেশে সরকার উৎখাতের চেষ্টা চালানো হবে জানুয়ারির ৯-১০ তারিখে। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছে ২০০৯ সালে বে-আইনি ঘোষিত হিজব-উই-তাহির। এই চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ১৬ জন সেনা অফিসার এবং এই ঘটনা থেকে শঙ্কা জাগছে দেশের এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সেনার ভেতরে কতজন এমন সেনা রয়েছে।

বে-আইনি ওই গোষ্ঠীকে প্রচ্ছন্নভাবে মদত জুগিয়ে চলেছে বি এন পি এবং জে ই আই গোষ্ঠী। ২০১১-র মে মাসে ঢাকায় অসংখ্য পুস্তিকা বিলি করা হয়েছে যাতে সরকারকে বলা হয়েছে 'খেলাফত' আন্দোলনের জন্য ঢাকায় মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হোক। ঢাকায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এবং শহরতলী অঞ্চলেও বিজ্ঞাপন দিয়ে 'খেলাফতে'র কথা বলা হয়েছে যাতে রয়েছে হাসিনা সরকারকে উৎখাত করে 'খেলাফত রাজ' কায়েমের কথা। এই পুস্তিকার বক্তব্য হলো দেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে দেশে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করা এবং এই বাহিনীকে ভারত-বৃটিশ-মার্কিন প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে।

এইসব পুস্তিকায় শেখ হাসিনাকে ইসলাম বিরোধী ভারত-মার্কিন দালাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। হিজব-উই-তাহির গোষ্ঠীর নেতা- কর্মীদের মধ্যে দেশে বিভিন্ন ভাবে সক্রিয় প্রায় ৩৫০ জন সদস্য যার মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা মুখ্য সঞ্চালক গোলাম মওলা, মর্শেদুল হক এবং মহম্মদুল বারি— এঁদের দল বে-আইনি ঘোষিত হবার অব্যবহিত পরেই ২০০৯ সালের ২০ অক্টোবর গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এই গোষ্ঠীর সক্রিয়তা আজও বিদ্যমান।

গোষ্ঠীর কর্মীরা খোলাখুলি দেশে ঐশ্লামিক রাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী, গণতান্ত্রিক বিরোধী প্রচার সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। হাট বা হিজব্-উই-তাহির হলো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা জেরুজালেমে গঠিত হয় ১৯৫৩ সালে সেখানে প্যালিস্তানীয় রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে। বাংলাদেশে এই 'হাট' তাদের কাজকর্ম শুরু করে ২০০০ সালে। হাসিনা সরকার ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ রাইফেলের জওয়ানদের অভ্যুত্থান প্রতিহত করে। সরকার শীঘ্রই সেই বিদ্রোহ কড়া হাতে দমনও করে। বিদ্রোহী বি ডি আর জওয়ানরা আত্মসমর্পণ করে অস্ত্র জমা দিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় সেনার একাংশ অফিসারদের উষ্মা দমন করা গেল না। বরং উল্টে দেখা গেল, সেনা প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার প্রাথমিকভাবে যাদের ওপর দয়ার মনোভাব নিয়েছিল, তারাই এই দলে। বি এন পি-জে ই আই জোট নিজেদের স্বার্থে এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সেনা অফিসারদের উস্কানি দিতে লাগলো যাতে সরকারের বিরুদ্ধে তারা জেহাদ ঘোষণা করে।

সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন এবং তাঁর উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন অফিসারদের অপূর্ব দক্ষতা ও সহায়তায় সরকার সেনা বিদ্রোহ থেকে রক্ষা পেল, নইলে ১৯৭৫ সালের১৫ আগস্টের মতো সেনা অভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনা সরকার ভেসে যেত। উল্লেখ্য, ওই দিনের রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও জনক শেখ মুজিবর রহমানকে আত্মবলিদান দিতে হয়েছিল। বি ডি আর বিদ্রোহ ছিল এ ধরনের অভ্যুত্থানের প্রথম প্রয়াস যার মাধ্যমে একটি নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে দেবার এক গভীর চক্রান্ত হচ্ছিল। সেনার ভিতরে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরা দেশের মৌলবী ও ভাড়াটে সৈন্যদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখত যাতে গণতন্ত্রকে উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা যায়। অন্যদিকে সেনার ভিতরে এখনও অনেকে আছেন যাঁরা রাজনীতিতে নিজেদের অংশীদার করতে চান না।

বি ডি আর বিদ্রোহের প্রথম বার্ষিকী-তে এইচ-ইউ-টি (হিজব- উই-তাহির) সেনা ছাউনি এলাকায় পুস্তিকা বিতরণ করে সেনাদের সরকার-বিরোধী বিদ্রোহী হতে আহ্বান জানায় যাতে করে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে দেশে আল্লার আইন লাগু করা যায়। এই পুস্তিকায় বলা হয় যে, হাসিনা সরকার বি ডি আর বিদ্রোহকে সামনে রেখে সেনা অফিসারদের হত্যা করেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল সেনা অফিসারদের প্ররোচনা দিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তোলা। বাংলাদেশে বে-আইনি ঘোষিত হবার পর এইচ- ইউ-টি বৃটেনের (ইউ-কে) শাখা থেকে গোপনে টাকা আসতে লাগলো বাংলাদেশে সংস্থাটির হাতে বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে। যাতে বিদ্রোহীরা গোপনে জে-ই-আই এবং ইসলামি ছাত্র শিবিরের মাধ্যমে দেশের মধ্যে অস্থিরতা তৈরী করতে পারে। সেনা বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই দেশের এক বিরাট অংশ বি এন পি/জে ই আই সমর্থক নাগরিক সমাজ, মিডিয়া, রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং পাকিস্তান সমর্থকরা অপপ্রচার শুরু করল এই বলে যে, হাসিনা সরকার দেশের সেনাবাহিনীকে দুর্বল করতে ভারতের সহায়তায় বি ডি আর সেনা বিদ্রোহ দমন করেছে যাতে ভারতীয়দের আগ্রাসন সহজতর হয়। এই অপপ্রচার বিদেশে বসবাসকারী প্রভাবশালী বাংলাদেশীদের মধ্যে পৌঁছে গেল। বি এন পি এবং জে ই আই-র অপকৌশল হলো দেশের অভ্যন্তরে অরাজকতা তৈরি করে আইন-শৃঙ্খলা ভেস্তে দেওয়া এবং এইচ-ইউ-টি ও জামাতুল-মুজাহিদিন ইত্যাদি বাংলাদেশী জেহাদিদের এককাট্টা করে নিজেদের দিকে টেনে আনা। এইচ-ইউ-টি এবং জে এস বি জেহাদীরা এখন তৃণমূলস্তরে ভীষণ সক্রিয় কারণ বি এন পি-জে ই আই শাসনকালে এরা এদের পরোক্ষ সমর্থন পেয়ে এসেছে।

এই চক্র এতটাই অপরাজেয় যে নিরাপত্তাবাহিনী প্রচুর হাতিয়ারের সঙ্গে বিস্ফোরক উদ্ধার করা ও বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কাঠামো ধ্বংস করা সত্ত্বেও এবং সেইসঙ্গে হাজার হাজার কর্মীর গ্রেপ্তারির পরেও এরা দেশে সমানভাবে এখনও সক্রিয়।

(সৌজন্যে : অর্গানাইজার)

মঙ্গলনিধি

দক্ষিণ ২৪-পরগণা, ৩নং সোনাখালি, বাসন্তী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল হালদার তাঁর মধ্যমপুত্র শ্রী অলোক হালদারের বিবাহ উপলক্ষে গত ২৭ এপ্রিল সমাজে সেবাকাজের জন্য পরিবারের সকলের উপস্থিতিতে ১০০১ টাকা সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গ-এর সম্পাদক সন্দীপ পালের হাতে মঙ্গলনিধি স্বরূপ প্রদান করেন। উল্লেখ্য অলোক হালদার বাঁশদ্রোণী প্রভাত শাখার কার্যবাহ বিপুল হালদারের দাদা। Advt.

স্বস্তিকার দাম
প্রতি সংখ্যা - ৭.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ৩২৫.০০ টাকা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

দক্ষিণ চীন সাগর দখল করতে চাইছে চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ খুব ঘটা করে হিন্দি-চীনি ভাই ভাই ঘোষণার পর ভারতের প্রশাসনিক প্রধানেরা ভেবেছিলেন চীন তার বন্ধুত্বের নীতি বজায় রাখবে। পঞ্চশীল-এর ঘোষণাকে রূপ দিতে তৎপর হবে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই চীন তার স্বরূপ প্রকাশ করল। ভূমিগ্রাসের মনোভাব নিয়ে ঢুকে পড়ল ভারতে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পনেরো বছরের মধ্যে বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণ ঘটল ভারতে। যে দেশ একদা মৈত্রী বন্ধনের চুক্তিতে সই করেছিল, এখন ভারতবাসী বুঝতে পারল চীনের মৈত্রীর কথাবার্তা কলাপাতায় লেখার মতো। তা ধুয়ে ফেলতে অসুবিধে নেই। এদেশের বামপন্থীরা বলেছিল, 'চীন আক্রমণকারী নয়। ভারতই আক্রমণকারী।' এখনও সেই বদ্ধমূল ধারণার বৃত্তে পাক খাচ্ছেন এদেশের কম্যুনিস্টরা। তাঁরা চীন দেশের প্রেমে গদগদ। চীন যে ক্রমাগত ভারত-বিরোধী কাজ করে চলেছে— এই সরল সত্যটা তাঁর মানতে রাজি নন। তেমনই একটা কাজ করে চলেছে চীন বেশ আটঘাট বেঁধে— খবরটা ভারতের অজানা নেই। প্রতিবাদও জানানো হয়েছে আমাদের দেশের পক্ষ থেকে।

চীন ক্রমাগত দখলের নীতিতে এগোচ্ছে। বেজিং এখন সাউথ চীন সমুদ্রে দখল নেওয়ার জন্যে মানচিত্র তৈরি করছে। ওই অঞ্চলে ভারত তেল অনুসন্ধানের জন্য ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ করেছে। চীনের দখলদারি মতলবের ব্যাপারটা জানার পর ভারত কূটনৈতিক দিক থেকে কি কি করা যায় তার জন্যে ভাবছে। চীন অবশ্য ব্যাপারটা গোপন রাখেনি। চীনের ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর প্রধান জ্যাং ইয়ুনলিং জানিয়েছেন, "দক্ষিণ চীন সাগরে যা করা হচ্ছে তা বিভিন্ন ধারাবাহিক কর্মসূচির একটা, যার মাধ্যমে আগামীদিনে চীনের উপকারই হবে। ওই এলাকার জল নিয়ে বিতর্ক আছে। আমাদের দাবি আমরা জানাবো। তারই উদ্যোগ হিসেবে মানচিত্র তৈরি হচ্ছে। যার মাধ্যমে প্রমাণ করা ওই দক্ষিণচীন সমুদ্রে আমাদের অধিকার রয়েছে।' চীনের 'গ্লোবাল টাইমস'-এ একথা বেরিয়েছে।

ভারতের বক্তব্য কি? 'ন্যাশনাল অ্যাডমিনিসট্রেশন অফ সার্ভেইং, ম্যাপিং অ্যান্ড জিও-ইনফরমেশন' একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এবছর ২৫ মার্চ। ১৩টি সরকারি সংস্থা নিয়ে গড়া সংস্থা বলেছে, ভৌগোলিক সমীক্ষা চালানো হচ্ছে 'সাউথ চায়না সি'-তে। সমুদ্রের মানচিত্র আঁকা হচ্ছে। চীন নিজের এলাকা বলে যে দাবি জানাচ্ছে তা সীমান্ত প্রসঙ্গ।

চীন ক্রমাগত ওইভাবে দখলদারি মনোভাব চালানোয় শুধু ভারত নয়, আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে জাপান আর ভিয়েতনামও বেশ চিন্তিত। ওইরকম মানচিত্র তৈরির কাজ চলেছে ডিয়ায়ু দ্বীপপুঞ্জ, যার দখল নিয়ে চীন-জাপানে বিবাদ রয়েছে। ওইরকম ব্যাপার ঘটছে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কার এলাকা? চীন প্রতাপ দেখিয়ে এবং কৌশলে দখল নিতে চাইলেও বাধা পাচ্ছে। ভারত সজাগ হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। দাবি করা হচ্ছে, প্রতিবাদ হয়েছে ঠিক সময়ে। কিন্তু চীন এগিয়ে গেছে কৌশল-কর্মে। এদেশের যে তেরোটি সংস্থা কাজ করছে তার মধ্যে রয়েছে বিদেশ মন্ত্রক, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রক, বাণিজ্য মন্ত্রক।

তথ্যসূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, মানচিত্র তৈরির মাধ্যমে চীন চাইছে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ মেনে নিজের দখলদারি কায়েম করতে। তারা বিভিন্ন দ্বীপের ভূমি ও মানচিত্রে দেখিয়েছে, কয়েক বছরের জলোচ্ছ্বাসে পরিবর্তন ঘটেছে যেগুলির। চীনের প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ওই এলাকায় শান্তি কল্যাণ বজায় রাখার জন্যে চীন উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু চীনের এই মনোভাব প্রতিবেশী দেশগুলিকে বেশ চিন্তিত করেছে। তারা বুঝতে পারছে চীনের মতলব ভালো নয়। চীন বলতে চায়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দ্বীপগুলি সমেত ওই এলাকার মানচিত্র তৈরি প্রয়োজন। তাতে বিবাদ বিতর্কের বদলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে।

চীন নিজের মতলবি কাজের সাফাই নানাভাবে দিলেও ভারত বুঝতে পারছে, বিপদ একটা আসছে। এবং তা চীনের জন্যেই।

(সৌজন্যে : অর্গানাইজার)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ন
মাত্র দুই মিনিটে (ৈর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

মালদার গাজোল থেকে হিলি সীমান্ত দিয়ে গোরু পাচার হচ্ছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা॥ ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বিভিন্ন সময়ে গো-পাচারের ঘটনা ঘটেছে। যেহেতু ভারত থেকে গোরুর মাংস বাংলাদেশ হয়ে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে রপ্তানী হয়, সেইজন্য কাঁটাতারের বেড়া হলেও বিভিন্ন পদ্ধতিতে চোরা পথে বাংলাদেশে গোরু পাচার করতে চোরাকারবারীরা সক্রিয় থাকে। মালদা জেলার গাজোল ও উত্তর দিনাজপুর জেলার মাঝখানের একটি গ্রাম থেকে প্রতিদিন গোরু পাচার হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ম্যাটাডোর গাড়ি করে এই গোরুগুলি উত্তর দিনাজপুরের হিলি বর্ডার হয়ে বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গেছে, মালদা জেলার গাজোল থানার আলাল গ্রাম থেকে তিন কিমি দূরে জয় হাট ও আমিন হাটের মাঝখানে ঘোলহাট গ্রামে সন্ধ্যা হলেই ৮-১০টি ম্যাটাডোর গাড়ি ঢুকে পড়ে। সেখানে গোরুগুলি আগে থেকেই আনা হয়। পরে গাড়ীতে গোরুগুলিকে ভর্তি করে এমনভাবে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা হয় যাতে বাইরে থেকে দেখলে কোনও পণ্য ঢাকা রয়েছে বলে মনে হয়। লোডশেডিং হলেই এই গোরুগুলি সমেত গাড়ি গাজোল থানার পাশ দিয়ে হিলি বর্ডারে চলে যায়। স্থানীয় যুবকরা কয়েকবার গাড়িগুলির পিছনে পিছনে গিয়েছে, কিন্তু কিছু করতে পারেনি। এমনিতেই মালদা ও দুই দিনাজপুরে গো- সম্পদের ঘাটতি প্রশাসনের দৃষ্টি গোচরে এসেছে। দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং জৈব সারের চাহিদা অনুসারে ক্রমশ গোরুর সংখ্যা কমছে। প্রশাসন এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গত ৮ মে ভোররাতে বনগাঁর মহকুমা শাসক জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় এবং বি এস এফের যৌথ উদ্যোগে চাকদা-বনগাঁ রোডে ৩টি গাড়ি সমেত ৬৮টি গোরু এবং সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা থেকে আরও ৮৫টি মোট ১৫৩টি গোরু আটক করা হয় এবং ধৃত ২ পাচারকারীকে কোর্টে পাঠানো হয়। প্রতি মাসে বসিরহাট থেকে বনগাঁ পর্যন্ত দীর্ঘ সীমান্তে গড়ে ৩৫,০০০ গোরু উদ্ধার হচ্ছে, সঙ্গের ছবিটি গাইঘাটা থানার আঙরাইল বি এস এফ ক্যাম্প ৩৬ নং ব্যাটেলিয়ন-এর তোলা। ছবি ও তথ্য : রমেশ মণ্ডল।

দীপালির পরিবার সুবিচারের আশায় দিন গুণছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা॥ বিচার ব্যবস্থার মধ্যেও দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটায় প্রকৃত আসামীরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে এবং অপরাধ ক্রমশ বেড়ে চলছে। মালদা জেলায় জাল নোট, ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাতে এই রকম বড় অপরাধ ধামাচাপা পড়ে যাওয়াতে সাধারণ মানুষ বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছেন।

২০০৬ সালের ২৮ জুলাই মালদা জেলার বামনগোলা থানার মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের বকচর গ্রামে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী দীপালি রায় (১২)-কে তিনজন দুষ্কৃতী ধর্ষণ এবং খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলেছিল। ২০০৯ সালের ২১ জুলাই তৎকালীন মালদার ফাস্টট্রাক কোর্টের দ্বিতীয় আদালতের বিচারক দুই জন আসামী জাহাঙ্গীর শেখ ও আনারুল হককে মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেছিলেন। আর একজন আসামী নাবালক হওয়ায় তাকে জুভেনাইল কোর্টে পাঠানো হয়। পরবর্তী-তে আসামীরা কলকাতা উচ্চ আদালত থেকে (২১.২.২০১১) আশ্চর্যজনক ভাবে ছাড়া পেয়ে যায়। দীপালির বাবা এই ঘটনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। এরপর গত বছর জুন মাসে তিনি স্থানীয় মানুষদের সাহায্যে সুপ্রীম কোর্টে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করেন এবং সুপ্রীম কোর্ট আসামীদেরকে কোর্টে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

গত ১১ এপ্রিল ২০১২ এই অর্ডারের কপি হাতে আসাতে বকচর গ্রামে দীপালির পরিবার ও স্থানীয় মানুষদের মধ্যে আশার আলোর সঞ্চার হয়েছে। তাদের আশা এবার দোষীরা নিশ্চয় শাস্তি পাবে। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে দীপালির বাবার পক্ষে সুপ্রীম কোর্টে মামলার তদারক করছেন অমরেশ দত্ত।

ইমাম ভাতা ও হাসিম শেখ

হাফিজ ইব্রাহিম

সোজা-সাপ্টা

ইমাম-ভাতা

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দেশের শ্রীবৃদ্ধির (অর্থাৎ এখন যাকে উন্নয়ন বলছি) জন্য একটি সূত্র দিয়েছিলেন। সেই সূত্রে সাধারণ মানুষের কথা বলতে গিয়ে দুটি প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিলেন। তাদের একজন রামা কৈবর্ত, অন্যজন হাসিম শেখ। জাতি ধর্ম সম্প্রদায় তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেনি। এরা দুজন বাংলার কৃষক। সংখ্যাগরিষ্ঠ এই কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতি তথা শ্রীবৃদ্ধি হলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন হবে। অথচ এই সম্রাট সাহিত্যিককে আমরা প্রায় অচ্ছুৎ করেছি। বাংলা রাষ্ট্রভাষা যাদের তারাও এঁকে দূরে রাখতে পারলে স্বস্তিতে থাকেন।

আমাদের আলোচনার বিষয়টি কিন্তু ইমাম ভাতা। প্রশ্ন উঠতে পারে ইমাম ভাতা প্রসঙ্গে এসব কথা আসে কেন? উত্তরে বলা যায় ইমাম ভাতার ঘোষণা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বহুবারই রাজ্যের উন্নয়নের কথা বলেছেন। বলেছেন এরা সংখ্যালঘু, বলেছেন এঁদের দিকে নজর দেওয়া হয়নি ইত্যাদি। এসব নিয়ে প্রচুর বিতর্ক চলছে। অনেকেই বলছেন সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা গোল্লায় গেল। অনেকেই আবার জনস্বার্থ মামলা বা সংবিধান লঙ্ঘন মামলা করতেও পারেন। এমনকী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে সরকারেরও কঠোর সমালোচনা করতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র কথিত হাসিম শেখের প্রতিনিধি হয়ে এখানে কিছু বক্তব্য পেশ করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে একবিংশের এক দশক পেরিয়ে এসে হাসিম শেখের প্রতিনিধি দেখছে যে কেবল পিছিয়েই গিয়েছে তারা। ঊনবিংশ শতকে সে ছিল একজন দরিদ্র কৃষক।

রামা কৈবর্তের সঙ্গে তার কোনও তফাৎ ছিল না। ধর্ম নিয়ে কোনও জটিলতা তৈরি হয়নি। যে যার সমাজে আচার আচরণ পালন করেও রামা কৈবর্তের সঙ্গে তার হৃদ্যতা ছিল। যে যার ধর্মীয় কৃত্য যতটুকু সম্ভব পালন করেছে। স্বধর্মে স্থিত থিকেই রামা কৈবর্তের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই তথাকথিত নেতাদের কল্যাণে দেশের উন্নতির নামে নিজের উন্নতি করতে গিয়ে অবিরত প্রচারের কল্যাণে বৃত্তিগত সাম্য ভেঙ্গে ধর্ম তথা সম্প্রদায়ের বিষ গিলতে আরম্ভ করেছে। হাসিম শেখ তখন আর বাংলার একজন কৃষক নয়, একজন মুসলমান মাত্র। ভারত যখন অঙ্গচ্ছেদ করে স্বাধীন হলো, ভারতের মুসলমান তখন হলো সংখ্যালঘু। তারপর থেকে অনেক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গেল। রামা কৈবর্ত কিছুটা হলেও পরিকল্পনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছুটা উন্নত হলো। হাসিম শেখেরও পরিবর্তন হলো, কিন্তু সেই পরিবর্তনের পিছনে টান রইল মোল্লা মৌলবী পীর গাজী কাজিদের।

আধুনিক শিক্ষায় সামান্য কিছু শিক্ষিত হলেও বেশভূষা আচার- আচরণে আগে যতখানি মুসলমান ছিল এখন তার থেকে বলা যায় দুরন্ত মুসলমান হয়ে উঠেছে। অনেক নিষেধের বেড়া, বাধ্যতামূলক ধর্মীয় জলসায় যাওয়া, শরিয়তের খুঁটিনাটি মেনে চলতে গিয়ে দেশের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এই মুসলমানের উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সহ সরকারের গুচ্ছ গুচ্ছ পরিকল্পনা।

বলা বাহুল্য এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে লক্ষ লক্ষ টাকা বার্ষিক অপব্যয় করা হবে। কিন্তু এখনকার হাসিম শেখ জানে টাকা দিচ্ছ, নিচ্ছি, কিন্তু আমি আমার পথ থেকে এক চুলও সরব না। চিরকাল গরীব থেকে গরিবের সুযোগটা নিতে হবে। ধর্মাচার অটুট রাখতে হবে। আগেই বলেছি এখনকার হাসিম শেখের একটু পরিবর্তন হয়েছে। একটু লেখাপড়া শিখেছে পবিত্র কোরাণ আর হাদিশের বাংলা পড়তে পারে। জলসায় গিয়ে হাজি কাজিদের বাণীর অর্থ করতে পারে। ফলে হাসিম শেখ বুঝে উঠতে পারে না, জলসায় যা বলে বাস্তবে তা মানে না কেন? এঁরা কোরাণ হাদিশ থেকে কখনও সুর করে কখনও গমকে গমকে যে সব বাণী দেয় কাজে তা করে না কেন?

এ প্রশ্নগুলি কেন উঠল তা জানতে ইমাম ভাতা ঘোষণার স্থানকাল পাত্রের কথা একটু বিশদ জানা দরকার। নেতাজী ইনডোর

হাদিশের এক জায়গায় বলা আছে ইসলামে ভিক্ষাবৃত্তি অবৈধ। অনেক জায়গায় হজরত মহম্মদ (সাঃ) এই কথা অনেক ভাবে বলেছেন। যেমন কোথাও বলেছেন— ভিক্ষা করা আর নিজের মুখে আঘাত করা সমান। কখনও বলেছেন ‘যে ব্যক্তি ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে আল্লাহ্ তার জন্য অভাবের দ্বার উন্মুক্ত করে।’ এটা কি ধরে নেওয়া যায় ত্রিশ হাজার ইমামের মধ্যে কেউ এই হাদিশের নির্দেশটা জানতেন না? একজন স্পষ্টবাদী আল্লাহ্র একান্ত আশ্রিত ইমাম কি ছিল না যিনি নির্ভীকভাবে প্রতিবাদ করতে পারতেন— এই ইমামভাতা আমাদের শরিয়তের বিরুদ্ধে যাচ্ছে?

স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিল ত্রিশ হাজার ইমাম। কেউ কেউ বলে কুড়ি হাজার। তাদের সামনে ছিল সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগমের ব্যানার। একপাশে শহীদ স্তম্ভ অন্যপাশে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর মুখ। হাদিশের সুস্পষ্ট নির্দেশ কোনও জলসায় কোনও ছবি থাকবে না।

ছবি সম্পর্কে হাদিশে বলা আছে ছবির শিল্পী পরলোকে শাস্তি পাবে— তাদের বলা হবে যা তোমরা সৃষ্টি করেছ তাতে প্রাণ সঞ্চার কর। 'তিনি আরও বলেন যে গৃহে ছবি থাকে সে গৃহে ফেরেস্তা প্রবেশ করে না— শায়খান বুখারী।

হাদিশের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এই ছবিকে শুধু সম্মানই দেয়নি, যা একান্ত ভাবে ইসলামের ধর্মীয় ধ্বনি, অর্থাৎ নারা এ তক্‌দির ধ্বনির প্রাবল্যে স্টেডিয়াম কেঁপে উঠেছিল।

নারা অর্থে ধ্বনি, তক্‌বীর অর্থে আল্লাহর গুণগান— যদি এই অর্থই হয় তবে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে এই নারা কি শরিয়ত সম্মত?

হাদিশের এক জায়গায় বলা আছে ইসলামে ভিক্ষাবৃত্তি অবৈধ। অনেক জায়গায় হজরত মহম্মদ (সাঃ) এই কথা অনেক ভাবে বলেছেন। যেমন কোথাও বলেছেন— ভিক্ষা করা আর নিজের মুখে আঘাত করা সমান। কখনও বলেছেন 'যে ব্যক্তি ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে আল্লাহ্ তার জন্য অভাবের দ্বার উন্মুক্ত করে।' এটা কি ধরে নেওয়া যায় ত্রিশ হাজার ইমামের মধ্যে কেউ এই হাদিশের নির্দেশটা জানতেন না? একজন স্পষ্টবাদী আল্লাহ্‌র একান্ত আশ্রিত ইমাম কি ছিল না যিনি নির্ভীকভাবে প্রতিবাদ করতে পারতেন— এই ইমামভাতা আমাদের শরিয়তের বিরুদ্ধে যাচ্ছে? এটা ঠিক হচ্ছে না। অথচ ওঁরাই গ্রামে-গঞ্জে ধর্মীয় জলসায় জীবন-যাপনের নানা নির্দেশ দিয়ে যান।

অন্যদিকে যে ত্রিশ হাজার ইমাম এসেছেন অন্ততপক্ষে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজের তিন ওয়াক্তের সময় ওখানে কাটিয়েছেন। এ সময় তাঁদের নিজেদের মস্‌জিদে আজান দিয়েছিল কে? ওঁরা কি সবাই লোক ঠিক করে এসেছিলেন। তবে কি ডেপুটেশনে ইমামের কাজ করা যায়?

যদি যায় তাহলে ভাতা কেমন ভাবে ভাগ হবে? আমরা জানি সব মসজিদে মুয়াজিম অর্থাৎ আজান দেওয়ার লোক থাকে না। ইমামকেই দিতে হয়। ইমাম যদি অনুপস্থিত থাকেন তবে সব মসজিদে নমাজ হয়েছিল জোর করে বলা যায় না।

হজরত মহম্মদ (সাঃ) এর কথায় 'এমন একটা দিন আসবে যখন আমার উম্মতেরা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে মসজিদ নির্মাণ করবো কিন্তু ওই সব মসজিদে সামান্যই আবাদ হবে।' এখন এই বাণী যথার্থ বলেই মনে হচ্ছে। যাদের নির্দেশে মসজিদের ধর্মীয় ধারা চালু থাকে তারা আজ তা বন্ধ করে কৃপাপ্রার্থীর মতো এক জায়গায় জড়ো হয়েছেন।

এরপর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর আরও কয়েকটি কথা ইসলামের পক্ষে মেনে নেওয়া যায় না। তিনি বলেছেন ভাতা দেবেন ওয়াকফ বোর্ড থেকে। হাদিশ অনুসারে তা দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নাই। ওমর (রাং) কে মহম্মদ (সাঃ) বলেছিলেন 'গরীব মিসকিসকে দান করা হবে, ক্রীতদাসকে মুক্ত করার জন্য ব্যয় করা হবে। কিন্তু সে ওকে আপন সম্পত্তি রূপে ব্যবহার করতে পারবে না।' হাসিম শেখের কথা হলো, মুখ্যমন্ত্রী অন্যধর্মী। তিনি জানেন না ওয়াকফ্ সম্পত্তি কিভাবে কাজে লাগে। কিন্তু বিদ্বান বুর্জুয়া মুসলমান তো বহু ছিলেন, তাঁরা একটি কথাও বললেন না কেন? বাধ্য হয়ে বলতে হয় প্রাপ্তির আশায় পাগল হয়ে গেছেন ইমামকুল। না হলে এই কথাই তো ওঁরা বলে থাকেন বিভিন্ন জলসায়।

এই প্রসঙ্গে বিপরীত কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী— ইমামরা ভাতা নিয়ে সরকারী প্রচারকের কাজ করবে। এরও কোনও প্রতিবাদ উঠেছে শুনিনি বা দেখিনি। যদি বলা যায় মসজিদের কাজের পাশে সরকারি প্রচার করবার পারিশ্রমিক এই ভাতা। তবে ইমামদের আর ইমাম বলা যাবে কি। হাদিশেই বলা আছে ইমাম কারও ক্রীতদাস হবে না। তাঁরা নিজেরাই বলুন ভাতা ঘোষণা এবং তার পক্ষে ইমামদের অবস্থান একজন সাধারণ চাকরি প্রার্থীর মতো দেখাচ্ছে না কি?

একবিংশের হাসিম শেখ এখন এই সব দেখে একটি সিদ্ধান্তে আসতে চায় তা হলো প্রাপ্তি যোগ থাকলে কোরাণ হাদিশ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলিকে উপেক্ষা করা যায়। আমার মতো দুর্বল কোনও হাসিম শেখ সামান্য একটু অপরাধ বা ভুল করে ফেললে তাকে শূলে চড়াও। ইসলাম কি তাই বলে?

এত গেল শুধু সেদিনে মুসলমান মজলিশের কথা। ভাতা ঘোষণার যৌক্তিকতা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে উচিত কিনা এসব বিচক্ষণ মানুষেরা দেখবেন। আমি সামান্য হাসিম শেখের প্রতিনিধি, তথাকথিত বুর্জোয়াদের হালচাল দেখে বোবা হয়ে থাকি। ভাবতে কষ্ট হয় এই সব সরকারি বেতন ভোগী ইমামদের পেছনে দাঁড়িয়ে আমাদের ধর্মাচরণ করতে হবে। সরকার ডাকলে মসজিদের দায়িত্ব ফেলে সাড়া দিতে হবে। এতে সারা মুসলমান উম্মার কি সুবিধা হবে? ইমামকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে হাত পাততে দেখে এখনকার স্বল্প শিক্ষিত হাসিম শেখ লজ্জায় মাথা নোয়াবে।

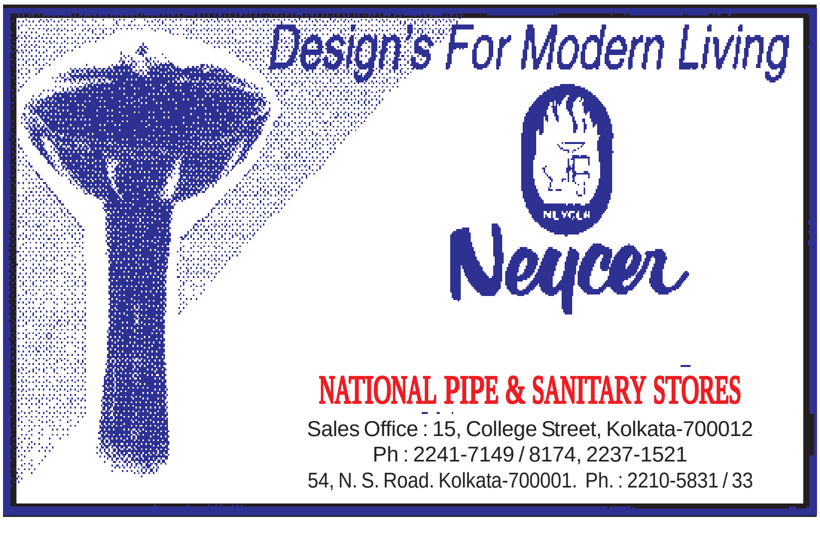

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
DUTA
Chicken Mutton
Sabji Mix
Kashmiri MIRCH POWDER
SUPER Cumin Powder
SUPER Turmeric Powder
Chilli Powder
SUPER Coriander Powder
BLACK Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

শুনে গান, করে দুগ্ধ দান

রোটারী মিল্কিং-পার্লার

নিজস্ব প্রতিনিধি। জায়গাটা পুণে থেকে ৬৫ কিমি দূরে, মানচরের খুব কাছে একটা ছোট্ট পাহাড়ের ওপর ৩৫ কিমি জুড়ে একটি গোশালা। সাতসকালে ভজনের করুণ আওয়াজ শুনে চমকে যেতে হয়। প্রশ্ন জাগে, এই নির্জন পর্বতগাত্রে জন-মনিষ্যিহীন গোশালায় এই সকরুণ রাগিণী মন ভরাচ্ছে কার? জায়গাটার নাম ভাগ্যলক্ষ্মী গোশালা। হলস্টেন থেকে স্থানীয়, প্রায় হাজার তিনেক গোরু দিব্যি ভজন শুনছে সকালবেলা। 'চুরালিয়া হ্যায় তুমনে যো দিলকো' মার্কা বলিউডি সঙ্গীত পর্যন্ত শুনছে। দিনভর গান শোনার ফাঁকে মায় রক ও পপ সঙ্গীতও গলাধঃকরণ করছে আনন্দে। কিন্তু এহেন সঙ্গীত-প্রেমী গোরুগুলি সম্পর্কে এই গোশালার উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ আধিকারিক অনিকেত থোরাট যা জানালেন তাতে বোঝা গেল চমকানোর এখনও কিছু বাকি আছে! তাঁর দাবি, সঙ্গীত গোরুগুলিকে শান্ত করে এবং এটা তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ যত গান শোনাবেন, ততই দুগ্ধ উৎপাদন বাড়বে।

এই ডেয়ারি শিল্পটি পরাগ মিল্ক ফুডস অ্যান্ড গোবর্ধনের চেয়ারম্যান দেবেন্দ্র শাহ-র মস্তিষ্কপ্রসূত। তিনি একটা গ্রামে দেখেছিলেন প্রতিদিন ভোরে ভজন শুনলে গোরুগুলোর খিদে বেড়ে যায়। বেশি খাবার সঙ্গে সঙ্গে দুধও দেয় বেশি। হিসেব করে তিনি দেখেছিলেন ৩.৫ শতাংশ বেশি হারে দুধ দেয় গোরুগুলি। সেই পরিকল্পনা

দাঁড়িয়ে আছে দুধেল গাইগুলি।

মাফিকই ভাগ্যলক্ষ্মী গোশালাকে সাজিয়েছেন শ্রী শাহ। গোশালার শেডের সিলিংয়ে মাইক্রোফোনের স্পীকার ফিট করা হয়েছে। এবং মিউজিক সিস্টেমের সঙ্গে তা সংযোগ করা রয়েছে। সকালে আধ্যাত্মিক ভজন দিয়ে গান শুরু হয় এবং পরে তা ধ্রুপদ ও জনপ্রিয় সঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়। গোশালার গোপালকরা খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে দেখেছেন, মিউজিকের প্রকৃতি অনুযায়ী গোরুগুলির আচরণও পাল্টে যায়। যেমন সেতার কিংবা ধ্রুপদ সঙ্গীতের সুর শুনে তারা শান্ত হয়ে বসে থাকে কিন্তু ড্রাম কিংবা অন্য জগঝম্প আওয়াজ শুনে তারা দাঁড়িয়ে পড়ে এবং গানের তালে তালে এদিক ওদিক চলতে থাকে (নাচতে তো আর পারে না!)। ২০০৭ থেকে এহেন 'মিউজিক থেরাপী' চলছে এবং এতে নাকি সাধারণ গোরুর চেয়ে ভাগ্যলক্ষ্মী গোশালার গোরুগুলি অন্তত ৪০ শতাংশ দুধ বেশি দেয় বলে ওই গোশালার কর্মকর্তাদের দাবি।

শুনলে অবাক হবেন, সঙ্গীতের এমনই আশ্চর্যজনক প্রভাব যে গোরুগুলোকে কখনই বাঁধার প্রয়োজন হয় না। এমনকী গোরুগুলো নিজেরাই শেডের 'মিল্কিং এরিয়া' (দুধ দোওয়ার স্থান, যার পোশাকী নাম রোটারি মিল্কিং পার্লার)-য় সুশৃঙ্খল ভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে। এতে কিন্তু গোশালার কোনও কর্মীরই সাহায্যের দরকার হয় না। যে কারণে সব মিলিয়ে জনা সত্তর কর্মী নিয়েই এতবড় গোশালা চলে যাচ্ছে ঠিকঠাকভাবে। রোটারি মিল্কিং পার্লারে একসঙ্গে গোটাপঞ্চাশেক গোরু দুধ দিতে পারে। দিনে তিনবার (ভোর ৫টা, দুপুর ১টা ও রাত ৯টা) দুধ দেয় তারা। গড়ে ২২-৪০ লিটার দুধ তো দেয়ই। গোরুগুলির স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্য এবং তাদের পরিচয়ের জন্যও রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাকটিভেশন ডিভাইস লাগানো হয়েছে এদের পায়ে। গোশালার এখন একটাই স্লোগান— "আমাদের গোরুগুলি অন্যরকম, কারণ তারা সুখী।"

সমাবেশ সমাচার

উত্তরবঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রশিক্ষণ বর্গ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংগঠনের ভিত্তি সমিতি ও সৎসঙ্গ। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হয়ে গেল সেই সমিতির সদস্যদের একদিনের প্রশিক্ষণ বর্গ। রায়গঞ্জে সারদা বিদ্যামন্দিরে ৩০ জন সদস্যদের বর্গ হয়ে গেল গত ৬-৭ এপ্রিল। আলিপুরদুয়ার জেলা ও কোচবিহার জেলার বর্গ হলো হাসিমারা ধর্মশালায় গত ২১-২২ এপ্রিল। সেখানে ৬৩ জন সদস্য যোগ দেন। মালদা জেলার বর্গ অনুষ্ঠিত হয় মালদা জেলা কার্যালয় পুড়াটুলি বাধ রোডে। শিলিগুড়িতেও এই বর্গ অনুষ্ঠিত হয়।

পরিষদের সাংগঠনিক পরিকাঠামো, বিভিন্ন সফল জন-আন্দোলন, সেবা কাজের পরিচয় এই বর্গে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। আগামী আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে যোজনা হয়। ১ থেকে ১১ জুন পরিষদ শিক্ষাবর্গে যাতে সমিতির সদস্যরা বেশি সংখ্যায় যোগ দেন তার যোজনা হয়। এই বর্গে পরিষদের উত্তরবঙ্গের সভাপতি ওমপ্রকাশ আগরওয়াল, সম্পাদক অসিত খামারী, সহ সম্পাদক নকুল ঝাঁ, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক গৌতম সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মশাটে রক্তদান শিবির

স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে গত ২২ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলার মশাট খণ্ডের পরিচালনায় এবং অনন্তরামপুর যজ্ঞেশ্বর সেবাসঙ্ঘের সহযোগিতায় কলকাতার হেলথ পয়েন্ট ব্লাড ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সংঘটিত হয়। গ্রীষ্মের প্রখর তাপপ্রবাহ সত্ত্বেও সাতজন মহিলাসহ মোট একান্নজন রক্তদাতা রক্তদান করেন। এক সময় রক্তদেবার জন্য লম্বা লাইন পড়ে যায়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা সুনীলপদ গোস্বামী, বিভাগ প্রচারক প্রফুল্ল ঘোষ, জেলা প্রচারক গোপাল ঠাকুর, সমাজ সেবা ভারতীর (পশ্চিমবঙ্গ) পরিচালন কমিটির সদস্য ডাঃ সনৎ কুমার বসুমল্লিক, শিবদাস বিশ্বাস প্রমুখ।

হিন্দু রোটি রুজি বাঁচাও আন্দোলন

কেন্দ্র ও রাজ্যের হিন্দু-বিরোধী আইন প্রণয়ন তথা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে ব্যাপক ধর্না, পথসভা এবং প্রধানমন্ত্রী/রাষ্ট্রপতিকে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচী নেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকের মাধ্যমে। মালদা, রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে জনবহুল স্থানে পথসভা হয়। যেখানে অনেক লোক দাঁড়িয়ে বক্তব্য শোনেন। সাম্প্রদায়িক হিংসা বিল, হিন্দু OBC/SC/ST সংরক্ষণ থেকে সংখ্যা কমিয়ে তা মুসলমানদের দেবার চক্রান্ত, চাকুরী, শিক্ষা, ব্যবসায় হিন্দু মুসলমানদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা, ইমামদের বেতন এবং উর্দুকে সরকারের দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার বিরুদ্ধে বক্তারা সরব হন।

পুরুলিয়ায় বাউল মেলা

ধর্মজাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে পুরুলিয়া জেলার বরাবাজার খণ্ডের বেড়াদা গ্রামে গত ১০ ও ১১ এপ্রিল দুইদিন ব্যাপী ধর্মসভা ও বাংলার বিভিন্ন জেলার বাউল শিল্পীদের গানের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত ধর্মজাগরণ প্রমুখ সনাতন মাহাতো ও স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ। তিনি বলেন, আগামী দিনে হিন্দুধর্মই বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। বর্তমান বিশ্বে পরিবেশের সংকট, উষ্ণায়ন, সন্ত্রাসবাদ সব সমস্যার সমাধান হিন্দু সংস্কৃতির প্রসারের মাধ্যমেই সম্ভব। উল্লেখ্য, এই গ্রাম কিছুদিন আগে খুব উপদ্রুত এলাকা হিসাবে গণ্য হোত। পুরুলিয়া জেলায় এইরকম ধর্মসভা ও বাউল মেলা একান্ত প্রয়োজন বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

সংস্কৃত ভারতীর কার্যালয়ে সম্ভাষণ শিবির

মে মাসের ১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত ২৬, বিধান সরণি কলকাতা-৬-এ সংস্কৃত ভারতীর কার্যালয়ে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো। ২৬ জন শিক্ষার্থী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

গত ১০ তারিখে এই শিবিরের সমাপন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সমাপন কার্যক্রমে সকল শিক্ষার্থী সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই নাটক, গান, অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রভৃতি কার্যক্রমের দ্বারা উপস্থিত সকলকেই মুগ্ধ করেন। কার্যক্রমের সভাপতি ছিলেন অরুণ কুমার ভট্টাচার্য। যিনি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সেবানিবৃত্ত অফিসার। প্রধান বক্তা হিসাবে ছিলেন সাহা ইনস্টিটিউট্ অফ্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সংস্থায় কর্মরত সমিত দে। তিনি সম্পূর্ণ ভাষণ সংস্কৃত ভাষায় বলে সবাইকে অবাক করে দেন। ''যাঁরা সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন করবেন তাঁরা ব্রাহ্মণত্বের সমপর্যায়ে আসীন থাকবেন''— স্বামী বিবেকানন্দের এই আদর্শকে তুলে ধরেন কার্যক্রমের মুখ্য অতিথি সমাজসেবী অরবিন্দ দাস। এই দশদিন যাবৎ পাঠদান করেন সংস্কৃত ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ।

সংস্কার ভারতীর উত্তর মালদা শিল্পী সম্মেলন

গত ৮ এপ্রিল উত্তর মালদা জেলার সংস্কার ভারতীর কলিগ্রাম, চাঁচল, হরিশচন্দ্রপুর তিনটি পৃথক শাখা একত্রিত হয়ে হরিশচন্দ্রপুর টাউন লাইব্রেরীর মাঠে শিল্পী সম্মেলনের প্রকাশ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধিকা রূপে উপস্থিত ছিলেন লোকসম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী, সংস্থার পূর্বাঞ্চল সম্পাদক সুভাষ ভট্টাচার্য, সুরকার গীতিকার মানস চক্রবর্তী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শান্তি চট্টোপাধ্যায়, সংস্কার ভারতীর উত্তরবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক চন্দন সেনগুপ্ত, উৎসব সমিতির সভাপতি ত্রিদিব মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট জন। উত্তর মালদা জেলার উৎসব সমিতির পক্ষে বিশিষ্টজনদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। সাংস্কৃতিক পর্বে কলিগ্রাম শাখার স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বিবেক-স্মরণ গীতি আলেখ্য, চাঁচল শাখার ক্ষুদে শিল্পীদের সমবেত কবিতা পাঠ, হরিশচন্দ্রপুর শাখার 'বসন্তবন্দনা' সঙ্গীত নৃত্যালেখ্য দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। শিল্পী সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল লোকসম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তীর লোকসঙ্গীত পরিবেশন।

হাওড়ার শিবপুরে কল্যাণ আশ্রমের অনুষ্ঠান

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের শিবপুর শাখার পক্ষ থেকে রামনবমীর বিশেষ শুভ দিনটিকে উপলক্ষ করে গত ১৪ মার্চ বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শিবপুর শাখার সংগঠন সম্পাদক অমিত কুমার সাঁতরা, সভাপতি দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি ডাঃ রামগোপাল গুপ্ত, বিশেষ অতিথি ডাঃ চন্দন দে হাজরা প্রমুখ। তাঁরা সকলেই শ্রীরামচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দকে (তাঁর সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষে) মাল্যদান করেন। পরবর্তী পর্যায়ে নৃত্য, গীত, আবৃত্তি, নাটক প্রভৃতির সমন্বয়ে এক আনন্দ মুখরিত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল।

হৃষিকেশ গুপ্ত ইনস্টিটিউটের তৃতীয় বর্ষপূর্তি

গত ৮ এপ্রিল মালদা রুরাল হেলথ্ অ্যান্ড স্লাম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালিত সাহাপুর দোলমঞ্চ পাড়া, মালদায় 'হৃষিকেশ গুপ্ত হিন্দু ইনস্টিটিউটের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। সভাপতি এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং মালদা কালেক্টরেটের অবসর প্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান নিতাই চন্দ্র ঘোষ। উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমতি কেয়া তালুকদার। সোসাইটির সম্পাদক ডাঃ প্রভাত কুমার সরকার এবং সরস্বতী শিশু নিকেতনের প্রধান আচার্য তাপস কুমার গুপ্ত ধন্যবাদ জানান।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্তর্গত ধর্ম প্রসার বিভাগের 'কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ' ২৯ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বর্গে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের ৮টি জেলা থেকে ৫৭ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্গের কার্যসূচীর মধ্যে বৌদ্ধিক, চর্চা, বৈঠক, সৎসঙ্গ, প্রশ্নোত্তর ও জনসভা— এইগুলি ছিল অন্যতম।

রামপুরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ, জিয়াগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কৃপানন্দ মহারাজ, আশিস মহারাজ, আজিমগঞ্জ পরমানন্দ মিশনের কৃষ্ণানন্দ মহারাজ, পরিষদের অখিল ভারতীয় সম্পাদক ও ধর্ম প্রসার প্রমুখ ধর্মনারায়ণ শর্মা, ক্ষেত্রীয় ধর্ম প্রসার প্রমুখ অচ্যুতানন্দ কর, সুধাংশু কুমার পাত্র (প্রান্ত সম্পাদক) বর্গে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মার্গদর্শন করেছেন।

বর্গ উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট রণজয় বিশ্বাস দলমত নির্বিশেষে ইমাম ভাতার বিরুদ্ধে জিয়াগঞ্জবাসীকে এগিয়ে আসার অনুরোধ করেন। প্রধান বক্তা ধর্মনারায়ণজী বহু তথ্য সমন্বিত ভাষণে অতীত ও বর্তমান ভারতের জনসংখ্যা ভারসাম্যের বিচ্যুতি, মুসলমান তোষণ ও বিধর্মীদের অত্যাচার প্রভৃতি উল্লেখ করেন। ধর্মসভাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন বিশ্বজিৎ দাঁ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২৫ মার্চ, সিউড়ী নগরের বিবেকানন্দ শাখার প্রথম কার্যবাহ সত্যেন্দ্র প্রকাশ সেনগুপ্তকে 'শ্রদ্ধা'র পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

কল্যাণনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা জেলার নালাগোলা খণ্ড কার্যবাহ রতন চন্দ্র রায়ের প্রথম পুত্রের শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ১০০২ টাকা কল্যাণনিধি হিসাবে সীমা জনকল্যাণ সমিতির সংযোজক নির্মল নাথের হাতে অর্পণ করা হয়।

উত্তরবঙ্গের সীমা জনকল্যাণ সমিতির প্রান্ত সংযোজক নির্মল নাথের দ্বিতীয় পুত্র কৌশিক কুমার নাথের শুভ বিবাহ উপলক্ষে ২০০১ টাকা প্রবীণ প্রচারক ও ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের পর্যবেক্ষক রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের হাতে অর্পণ করা হয়।

পুস্তক প্রসঙ্গ

একদশকের ব্যবধানে নেতাজী সম্পর্কে রাশিয়ার আগ্রহের ঔদাসীন্যে রূপান্তর বিস্মিত করে

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে পরিশ্রমী গবেষক বলতে সর্বাগ্রে পূরবী রায়ের কথা মনে আসে। সেই ১৯৯০ এর দশক থেকে রাশিয়া ও অন্য দেশের অভিলেখাগার মন্থন করে নেতাজী সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করে চলেছেন তিনি। আলোচ্য গ্রন্থ ‘দি সার্চ ফর নেতাজী নিউ ফাইন্ডিংস’ সত্যিকার অর্থে নেতাজী অনুসন্ধান— নেতাজী সম্বন্ধে নতুন তথ্যের আকর। নেতাজীর ১৯৪১ সালে ভারত ত্যাগ থেকে ১৯৪৫ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি বছরের ঘটনা তিনি রাশিয়ান তথা জার্মানি, বৃটেন প্রভৃতি দেশের আর্কাইভ থেকে তুলে ধরেছেন— অজস্র কূটনৈতিক বাধা নিষেধ পেরিয়ে। নেতাজী সম্বন্ধে নেতাজী-বিদ্বেষীদের কুৎসার শেষ নেই। তার দুটি হলো নেতাজী হিটলারের সঙ্গে সখ্য করেছিলেন। আর নেতাজী এতদিন জার্মানি-জাপানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শেষ পরাজয়ের মুহূর্তে রাশিয়ার সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন। দুটি অভিযোগই অন্য অভিযোগের মতো মনগড়া। এই গ্রন্থে রুশ, জার্মান, বৃটিশ গোয়েন্দাদের রিপোর্ট থেকে দেখা যাবে নেতাজী প্রথম থেকেই ছিলেন হিটলার-বিরোধী। তিনি সেই ৩০-এর দশক থেকে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছেন। এবং রাশিয়াও নেতাজীর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল।

বৃটিশ গোয়েন্দারা অনুমান করেছেন অক্টোবর ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত নেতাজীর আজাদহিন্দ সরকারকে রাশিয়া স্বীকৃতি দিয়েছিল। শেষ ১০০ পৃষ্ঠা জুড়ে গবেষক শ্রীমতী রায় দেখিয়েছেন নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু সম্বন্ধে ভারত তথা বিদেশী দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিকদের পরস্পর বিরোধী মন্তব্য। আর যে নেতাজী সম্বন্ধে ৪০ এর দশকে রাশিয়া গভীর আগ্রহ ও সহানুভূতি দেখিয়েছে, ৫০ এর দশকের পর থেকে সেই নেতাজী সম্বন্ধে তার বিস্ময়কর ঔদাসীন্য।

গবেষক শ্রীমতী রায় আমাদের নেতাজী সম্বন্ধে গবেষণার এক নতুন দ্বার খুলে দিয়েছেন। আমাদের একান্ত অনুরোধ তিনি যেন তাঁর গবেষণার আরও সম্ভার আমাদের তুলে দেন।

অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত মহাশয়ের ‘ভেরিয়াস নেতাজী’ গ্রন্থে বিষয়ের ইঙ্গিত আছে। এটি তরুণ নেতাজী, নেতাজীর সাহিত্য বোধ, আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর নায়ক নেতাজী ইত্যাদি ৫টি প্রবন্ধের সংকলন। গ্রন্থটি পূরবী রায়ের উল্লেখিত গ্রন্থের বিপরীত মেরুতে রয়েছে। এতে কোনও গবেষণার স্থান নেই।

□ দি সার্চ ফর নেতাজী— নিউ ফাইন্ডিংস। পূরবী রায়। কলকাতা। ২০১১। দ্বিতীয় সংস্করণ ৪৫০ টাকা।

□ ভেরিয়াস নেতাজী। চিত্তব্রত পালিত। কলকাতা। ২০০৫। ১০০ টাকা।

সত্যজিতের জন্মদিনে সংবর্ধিত হলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়

'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' ছবির শুটিং-এর ফাঁকে সত্যজিত রায়ের সঙ্গে মাধবী মুখোপাধ্যায়

বিকাশ ভট্টাচার্য ॥ সম্প্রতি সত্যজিত রায়ের ৯২তম জন্মদিন (২ মে) উপলক্ষে নন্দন ও সিনেমা জগৎ পত্রিকার উদ্যোগে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২ থেকে ৪ মে প্রত্যেক দিন নন্দন প্রেক্ষাগৃহে সত্যজিতের পছন্দের একগুচ্ছ বিদেশী ছবি 'রে'জ পিক শিরোনামে প্রদর্শিত হলো। সত্যজিতের কয়েকটি ছবির স্থিরচিত্র ও সংলাপ নিয়ে তৈরি রঙিন পোস্টকার্ড প্রকাশিত হলো। প্রকাশ করলেন সন্দীপ রায়। ৬ মে বিকেলে হলো রে-কুইজ। সত্যজিতের ছবির মেয়েদের নিয়ে এক সেমিনারে বললেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, সোমা চট্টোপাধ্যায় ও বরুণ চন্দ। সত্যজিতের ৯২তম জন্মদিনের নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল সত্যজিতের অন্যতম প্রিয় নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা। যা বহু আগেই শিল্পীর পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাম জমানার নন্দন-বামবিরোধী এই শিল্পীকে সম্মান জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি।

শেষ পর্যন্ত রঞ্জিত মল্লিকের নেতৃত্বে নন্দন কর্তৃপক্ষ এই গুণী শিল্পীকে সম্বর্ধনা জানিয়ে যোগ্য কাজই করেছেন।

সত্যজিত রায়ের পরপর তিনটি ছবির নায়িকা হওয়ার সৌভাগ্য শুধুমাত্র মাধবীর। ছবি তিনটি হলো— 'মহানগর', 'চারুলতা' এবং 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' সিরিজের 'কাপুরুষ'। রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় ছোটগল্প 'নষ্টনীড়'। গল্পের নায়িকা চারুলতা। ওই গল্পের অসাধারণ চিত্ররূপকার সত্যজিত রায়। ছবির নামকরণ হলো 'চারুলতা'। নামভূমিকায় মাধবী মুখোপাধ্যায়। শিল্পীর জীবনে অন্যতম সেরা অভিনয়।

মাধবীর প্রথম ছবি 'টনসিল' (১৯৫৬)। তখন তাঁর নাম মাধুরী। পরিচালক তপন সিংহ। প্রযোজক বিজয় চট্টোপাধ্যায় নায়িকার নাম পরিবর্তন করে মাধুরী থেকে মাধবী করালেন। ছবির নাম 'বাইশে শ্রাবণ' (১৯৬০)। পরিচালক মৃণাল সেন। নায়ক জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। ১৯৬৫-এর 'সুবর্ণরেখা' ছবির সতী চরিত্রে মাধবী। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। এর থেকেই বোঝা যায় তাঁর চাহিদা। সত্যজিত-ঋত্বিক-মৃণাল- তপন— এঁদের সকলের ছবির নায়িকা মাধবী। অভিনয় জীবনের সূচনাতেই এমন সুযোগ ক'জন অভিনেত্রীর জীবনে ঘটে! সাফল্যের এখানেই শেষ নয়। চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রপতির সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার 'উর্বশী'র বাংলা ছবি থেকে একমাত্র প্রাপক মাধবী। বর্তমানে ওই নামে আর পুরস্কার দেওয়া হয় না। ছবির নাম 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৭০)। 'বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর পরপর তিনবার শ্রেষ্ঠ নায়িকার শিরোপা তো মাধবীর ভাগ্যেই জুটেছে। এও কি কম কথা!

ছায়া ছবিকে যখন অন্যধারার ছবি বা আর্ট ফিল্ম এবং বাণিজ্যিক বা কমার্শিয়াল ছবি— এই দুই ধারায় বিভক্ত করার চেষ্টা থাকে, তখনও মাধবী এই দুই ধারার ছবিতেই সমান ভাবে সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। উত্তমকুমারের সঙ্গে প্রথম অভিনয় 'থানা থেকে আসছি'তে প্রায় নির্বাক অভিনয়। শুধু চোখের চাহনি দিয়ে কী অপূর্ব অভিনয়! এছাড়া 'ছিন্নপত্র', 'বিরাজ বৌ' বা 'অগ্নীশ্বর' ছবিতে চরিত্রানুগ অভিনয় উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। এই জুটির আর এক উল্লেখযোগ্য ছবি 'ছদ্মবেশী'। কমেডি সেন্স যে শিল্পীর কতখানি, তা এই ছবি দেখলে বোঝা যায়। এছাড়া এই পর্যায়ে 'অদ্বিতীয়', 'গোধুলি বেলায়', 'সমান্তরাল', 'গণদেবতা', 'জীবনরহস্য'— আরও অজস্র ছবি তাঁর অভিনয় প্রতিভায় উজ্জ্বল।

অন্যধারার ছবিতে সত্যজিত-ঋত্বিক-মৃণাল-তপন ছাড়াও পূর্ণেন্দু পত্রীর তিন-তিনটে ছবি 'স্বপ্ন নিয়ে', 'স্ত্রীর পত্র' ও 'মালঞ্চ'। তিনটিই তাঁর অভিনয়ে সমৃদ্ধ। হরিসাধন দাশগুপ্তের 'একই অঙ্গে এত রূপ', রাজা মিত্রের 'একটি জীবন' ও উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর 'চোখ'— তাঁর অভিনয় প্রতিভাকে তুলে ধরতে কার্পণ্য করেনি।

এই আকাশছোঁয়া সাফল্যের পাশে ব্যর্থতার ইতিহাসও আছে। এন এফ ডি সি-র অর্থানুকূল্যে বড়পর্দার জন্য একটি ছবি পরিচালনা করেছিলেন। ছবির নাম 'আত্মজা'। ছবির তৈরীর সময়ই বাম-ইউনিয়ন প্রতিপদে তাঁকে বিপদে ফেলেছে। ছবিটি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায়নি। তাঁর প্রযোজনায় আশাপূর্ণা দেবীর 'সুবর্ণলতা'। বিজয় বসু পরিচালক। সব টিকিট এক টাকা। তবু দর্শক-পৃষ্ঠপোষকতা পেলেন না।

সে তুলনায় মঞ্চে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা তাঁর অত্যন্ত সুখকর। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত বিশ্বরূপা থিয়েটারে অভিনীত 'ফেরা' নাটকে এক প্রতিহিংসাপরায়ণা নারীর চরিত্রে তাঁর দুর্ধর্ষ অভিনয় এখনও চোখে ভাসছে। এছাড়া কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে তারাশঙ্করের 'না', তপন থিয়েটারে 'জননী' এবং আশুতোষ মঞ্চে 'বিন্দুর ছেলে' নাটকের তাঁর মঞ্চাভিনয় স্মরণীয়। ১৯৯১-এর ১২ অক্টোবর যখন স্টার থিয়েটারে আগুন লাগে, তখন সেখানে যে নাটক চলছিল, সেই 'ঘটক বিদায়' নাটকেও তিনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিপরীতে অভিনয় করছিলেন।

এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর জন্ম ১৯৪৩ সালের ১০ মার্চ। অর্থাৎ আগামী বছর তাঁর বয়স হবে ৭০। বাবার নাম শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মা ছিলেন একসময়ের নামকরা মঞ্চাভিনেত্রী। স্বামী নির্মলকুমার— বাংলা ছায়াছবি জগতের প্রতিভাধর অভিনেতা।

শব্দরূপ-৬২৬ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

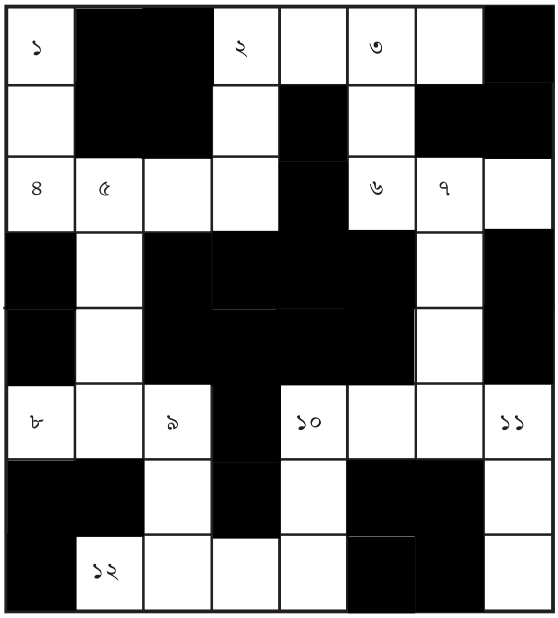

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. শ্রীকৃষ্ণের পত্নীবিশেষ, ৪. ওড়িশার নীলগিরি পর্বতমালা; জগন্নাথক্ষেত্র, ৬. গর্দভ; প্রথম দুয়ে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যলীলা, ৮. হিমালয়পত্নী; শকুন্তলার জননী, ১০. বিষ্ণু ও শিব, ১২. এতে মই দেওয়া মানে সবকিছু পণ্ড করে দেওয়া।

উপর-নীচ : ১. "ভাঁড়ে মা—", ২. সঙ্গতিপন্ন, ৩. সাধু-সন্ন্যাসীদের রসদ অন্নসত্র, ৫. লক্ষবার বহ্নিতে দহন করিয়া শুদ্ধ, ৭. সত্য বা ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা; অধ্যবসায় ও দুঃখবরণ, ৯. শ্লোকময় ব্যাখ্যাপুস্তক; কর্মকর্ত্রী, ১০. হোম, ১১. ছারপোকা।

সমাধান শব্দরূপ-৬২৩

ঠি	কু	জি		উ	রু	ক্র	ম
লি		গি	রি	জা			
	লো	র		ন	ন্দ	ঘো	ষ
	ম					ষ	
	পা					ব	
দা	দ	খা	নি		স	তী	
			কু	ল	টা		বৃ
অ	স	ম	ঞ্জ		ন	হু	ষ

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সিদ্ধার্থ হালদার
আসানসোল, বর্ধমান

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬২৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ১১ জুন, ২০১২ সংখ্যায়

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

।। চিত্রকথা।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ।। ২৩

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

ডাঃ সুজিত ধর ফাউণ্ডেশনের আলোচনাসভা

‘চীন-ই ভারতের কাছে বড় বিপদ’

মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) মানস ঘোষ, অসীম কুমার মিত্র, মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলী, অচিন রায় ও পূরবী রায়। ছবি : বাসুদেব পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ “ভারতবর্ষের আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে চীনই বড় বাধা। চীন সুপরিকল্পিত রণকৌশলের অঙ্গ হিসেবে তার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় প্রভাব বিস্তার করছে। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে ভারতের নিরাপত্তা। স্বাধীনোত্তর ভারতের নেতাদের বোঝা উচিত ছিল আমরা কাউকে আক্রমণ না করতে পারি, কিন্তু অন্যরা তো আমাদের আক্রমণ করতেই পারে। এটা বুঝেই আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক, সময়োপযোগী ও শক্তিশালী করতে হবে। এছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা নেই। চীনের তিব্বত আগ্রাসনকে স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের নেতারা ভুল করেছেন। ভারত সীমান্ত জুড়ে চীন সবরকম সমরসম্ভার ব্যবহার করবার উপযুক্ত পরিকাঠামো— রেল ও সড়কপথ তৈরি করে সেনা মোতায়েন করেছে। আমরা তো ১৯৬২-র লজ্জাকর পরাজয় থেকে কোনও শিক্ষাই নিইনি। কোনও অজ্ঞাত কারণে আজও অরুণাচলে আমরা সড়ক পরিকাঠামো পর্যন্ত তৈরি করতে পারেনি। ১৬ অক্টোবর, ১৯৬২-তে ভারত আক্রমণের অনেক আগেই চীনা গুপ্তচররা ভারতবর্ষের চীন সীমান্তের অনেক ভিতর পর্যন্ত ঢুকে বসেছিল। আজও তাদের গুপ্তচররা একই রকম সক্রিয়। ভারত-চীন সীমান্তে ভারতের প্রতিটি গতিবিধির পুঙ্খানুপুঙ্খ চীনের নখদর্পণে। এছাড়া চীন থাইল্যান্ড, মায়ানমার, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে নানারকম সাহায্য দিয়ে নিজেদের প্রভাবাধীনে আনার চেষ্টা করে অনেকটা সাফল্যলাভ করেছে। এটা ভারতের পক্ষে গভীর উদ্বেগের বিষয়। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা সেনাপ্রধান জেনারেল ভি কে সিং-এর চিঠিতে ভারতের সমরসম্ভারের দুরবস্থাটা সবার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এখন সাধারণ নাগরিক সমাজকে সচেতন হয়ে সরকারকেও সচেতন হতে বাধ্য করবে।”

গত ১৩ মে সন্ধ্যায় আর এস এসের কলকাতার প্রাক্তন সঙ্ঘচালক ও বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রয়াত ডাঃ সুজিত ধরের নামে গঠিত ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশন আয়োজিত আলোচনাচক্রে উপরোক্ত মন্তব্য করেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) কে কে গাঙ্গুলি। তিনি ফাউন্ডেশন আয়োজিত আলোচনা সভার ‘চীনা আক্রমণের ৫০ বছর’ শীর্ষক বিষয়ে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন। মেজর জেনারেল গাঙ্গুলি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমাদের অগ্নি-৫ মিসাইল সফল হওয়াতে অনেকটাই সুস্থিরতা এসেছে। প্রতিবেশী দেশের অনেক ভিতর পর্যন্ত আমাদের মিসাইলের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে। ফলে প্রতিবেশীদের দুঃসাহস অনেকটাই কমবে।’

আলোচনাসভার সূত্রপাত করেন প্রবীণ সাংবাদিক অসীম কুমার মিত্র। তিনিই বিষয়টি উপস্থাপন করে সভা পরিচালনা করেন। সভার অন্য বক্তা বাংলা দৈনিক ‘স্টেটস্ম্যান’ পত্রিকার সম্পাদক মানস ঘোষ অবশ্য অনেকটা আশার কথা শোনালেন। তাঁর কথায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে চীন। চীনে সাধারণ মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ। দুর্ভিক্ষ, মহামারী লেগেই আছে। যে কোনওদিন চীন ভেঙে পড়বে। আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন বাংলা দৈনিক স্টেটস্ম্যানের সম্পাদকীয় উপদেষ্টা অচিন রায়। তিনি তাঁর ভাষণে ভারতের দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রয়াত দুই শীর্ষ নেতা-নেত্রীকে দায়ী করেন। সবশেষে ফাউন্ডেশনের পক্ষে ধন্যবাদ জানান অরুণ ভট্টাচার্য।

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যেকোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন। — ব্যবস্থাপক

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
21 May - 2012

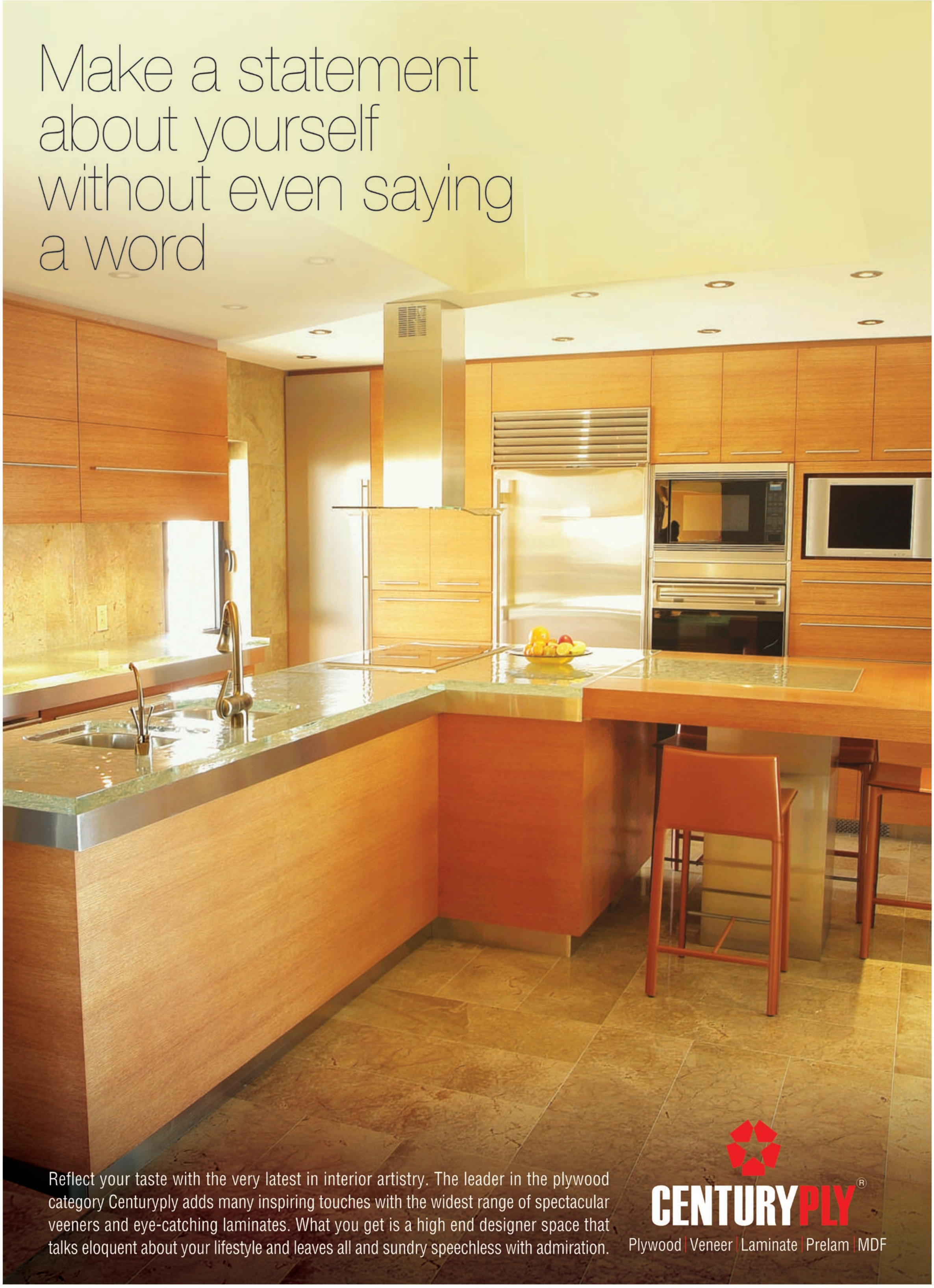

দাম : ৭.০০ টাকা